বাদশাহ নামদার
হুমায়ূন আহমেদ
PANJABIWALA

বাদশাহ নামদার

হুমায়ূন আহমেদ

অন্যপ্রকাশ

উৎসর্গ

নিনিত হুমায়ূন

আমার কেবলই মনে হচ্ছে পুত্র নিনিত
পিতার কোনো স্মৃতি না নিয়েই বড় হবে।
সে যেন আমাকে মনে রাখে এইজন্যে
নানান কর্মকাণ্ড করছি। আমি ছবি তুলতে
পছন্দ করি না। এখন সুযোগ পেলেই
নিনিতকে কোলে নিয়ে ছবি তুলি।

এই বইয়ের উৎসর্গপত্রও স্মৃতি মনে রাখা
প্রকল্পের অংশ।

“রাজ্য হলো এমন এক রূপবতী তরুণী
যার ঠোঁটে চুমু খেতে হলে
সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রয়োজন হয়।”

(হুমায়ূনের বিদ্রোহী ভ্রাতা মির্জা কামরানের
লেখা কবিতা)

ভূমিকা

কেউ যদি জানতে চান 'বাদশাহ নামদার' লেখার ইচ্ছা কেন হলো, আমি তার সরাসরি জবাব দিতে পারব না। কারণ সরাসরি জবাব আমার কাছে নেই।

শৈশবে আমাদের পাঠ্যতালিকায় চিতোর রানীর দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূনকে রাখি পাঠানো-বিষয়ক একটা কবিতা ছিল। একটা লাইন এরকম: "বাহাদুর শাহ্ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়।" এই কবিতা শিশুমনে প্রবল ছাপ ফেলে বলেই শেষ বয়সে সম্রাট হুমায়ূনকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসব এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

সব ঔপন্যাসিকই বিচিত্র চরিত্র নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। এই অর্থে হুমায়ূন অতি বিচিত্র এক চরিত্র। যেখানে তিনি সাঁতারই জানেন না সেখানে সারা জীবন তাঁকে সাঁতরাতে হয়েছে স্রোতের বিপরীতে। তাঁর সময়টাও ছিল অদ্ভুত। বিচিত্র চরিত্র এবং বিচিত্র সময় ধরার লোভ থেকেও *বাদশাহ নামদার* লেখা হতে পারে। আমি নিশ্চিত না।

আমার নিজের নাম হুমায়ূন হওয়ায় ক্লাস সিক্স-সেভেনে আমার মধ্যে শুধুমাত্র নামের কারণে এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি হয়। সেই সময়ের পাঠ্যতালিকায় মোঘল ইতিহাস খানিকটা ছিল, তাতে শের শাহ্'র হাতে হুমায়ূনের একের পর এক পরাজয়ের কাহিনী। হুমায়ূনের পরাজয়ের দায়ভার খানিকটা আমাকে নিতে হয়েছিল। ক্লাসে আমাকে ডাকা হতো 'হারু হুমায়ূন'। কারণ আমি শুধু হারি। আমি কার কাছে হারি? মহান সম্রাট শের শাহ্'র হাতে—যিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন, গ্রান্ডট্রাংক রোড বানান। আমি শুধু পালিয়ে বেড়াই। হায়রে শৈশব!

এমন হওয়া অসম্ভব না যে শৈশবের নাম নিয়ে হীনমন্যতাও *বাদশাহ নামদার* লিখতে খানিকটা ভূমিকা রেখেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে বাদশাহ নামদার লেখার কারণ জানা গেল না, তাতে জগতের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি লিখে প্রবল আনন্দ পেয়েছি—এটাই প্রথম কথা এবং শেষ কথা।

সম্রাট হুমায়ূন বহু বর্ণের মানুষ। তাঁর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে আলাদা রঙ ব্যবহার করতে হয় নি। আলাদা গল্পও তৈরি করতে হয় নি। নাটকীয় সব ঘটনায় তাঁর জীবন পূর্ণ।

উপন্যাসটি লেখার সময় প্রচুর বইপত্র বাধ্য হয়ে পড়তে হয়েছে। একটি নির্ঘণ্ট দিয়ে নিজেকে গবেষক-লেখক প্রমাণ করার কারণ দেখছি না বলেই নির্ঘণ্ট যুক্ত হলো না।

বাদশাহ নামদারের বিচিত্র ভুবনে সবাইকে স্বাগতম।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া
ধানমণ্ডি

বাঙ্গালমুলুক থেকে কাঁচা আম এসেছে। কয়লার আগুনে আম পোড়ানো হচ্ছে। শরবত বানানো হবে। সৈন্ধব লবণ, আখের গুড়, আদার রস, কাঁচা মরিচের রস আলাদা আলাদা পাত্রে রাখা। আমের শরবতে এইসব লাগবে। দু'জন খাদ্যপরীক্ষক প্রতিটি উপাদান চেখে দেখেছেন। তাঁদের শরীর ঠিক আছে। মুখে কষা ভাব হচ্ছে না, পানির তৃষ্ণাবোধও নেই। এর অর্থ উপাদানে বিষ অনুপস্থিত। সম্রাট বাবর নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারবেন। গত বছর শীতের শুরুতে সম্রাট বাবরকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপর থেকেই বাড়তি সতর্কতা।

সম্রাট তখ্‌ত্ রওয়ানে (চলমান সিংহাসন) আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর মাথায় রাজস্থানী বহুবর্ণ ছাতি। তাঁর দু'দিকে দু'জন বড় পাখায় হাওয়া দিচ্ছে। প্রধান উদ্দেশ্য মাছি তাড়ানো। এই অঞ্চলে মাছির বড়ই উৎপাত।

রুপার পাত্রে আমের শরবত নিয়ে খিদমতগার সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে আছে। সম্রাট পাত্র হাতে না নেওয়া পর্যন্ত খিদমতগার মাথা উঁচু করবে না। সম্রাট পাত্র হাতে নিচ্ছেন না। তাঁকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। যদিও চিন্তিত হওয়ার মতো কারণ ঘটে নি। পানিপথের যুদ্ধে তাঁর প্রধান শত্রু ইব্রাহিম লোদী পরাজিত এবং নিহত হয়েছেন। ইব্রাহিম লোদীর মৃতদেহ তাঁকে দেখানো হয়েছে। তবে বিরক্ত হওয়ার মতো কারণ ঘটেছে। তিনি তাঁর প্রথম পুত্র নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন মীর্জার উপর বিরক্ত। এই ছেলে অলস এবং আরামপ্রিয়। সে ঘর-দরজা বন্ধ

করে একা থাকতে পছন্দ করে। পিতাকে লেখা এক পত্রে সে লিখেছে—'আমার মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না। আমি একা থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।' একাকিত্ব রাজপুরুষদের মানায় না। হুমায়ূনকে পাঠানো হয়েছে ইব্রাহিম লোদীর রাজধানী এবং কোষাগার দখল করতে। ইব্রাহিম লোদীর কোষাগার আগ্রা দুর্গে। এই কাজ শেষ করতে এত সময় লাগার কথা না। সে নিশ্চয়ই কোনো ভজঘট করে ফেলেছে। দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার মতো দায়িত্ববান হুমায়ূন মীর্জা না। সম্রাট নিজেই আগ্রার দিকে রওনা হয়েছেন। কাঁচা আমের শরবত খাওয়ার জন্যে যাত্রাবিরতি।

সম্রাটের সেনাপতির একজন ফিরোজ সারাঙ্গখানি বললেন, বাদশাহ্ কি কোনো কারণে অস্থির ?

বাবর বললেন, আমি অস্থির, তবে অস্থিরতার কারণ জানি না। গতরাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্ন অস্থিরতার কারণ হতে পারে।

ফিরোজ সারাঙ্গখানি দুঃস্বপ্ন কী জানতে চাচ্ছেন। কিন্তু সম্রাটের দুঃস্বপ্ন জানতে চাওয়া যায় না। বড় ধরনের বেয়াদবি।

সম্রাট বললেন, দুঃস্বপ্ন কী জানতে চাও ? শোনো। আমি দেখলাম আমার তাঁবুতে একটা ভেড়া ঢুকে পড়েছে। ভেড়াটার একটা পা নেই, সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ভেড়াটা লাফ দিয়ে আমার কোলে এসে পড়ল এবং আমার পায়ে মুখ ঘষতে লাগল। তখনই ঘুম ভাঙল।

স্বপ্নের ফলাফল অবশ্যই শুভ।

একটা পঙ্গু ভেড়া লাফ দিয়ে আমার কোলে এসে উঠল। এর ফলাফল শুভ কীভাবে হয় ? হুজুর মীর আবুবকার-এর কাছ থেকে স্বপ্নের তফসির জানতে হবে।

কথা বলতে বলতেই বাবর তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। অনেক দূরে ধুলার ঝড়ের মতো উঠেছে। অশ্বারোহীর দল কি ছুটে আসছে ? কোনো

বিদ্রোহী বাহিনী ? হওয়ার তো কথা না। অশ্বারোহীর দল আগ্রার দিক থেকেই আসছে। এমন কি হতে পারে আগ্রার দুর্গে বন্দি গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিবারকে উদ্ধার করতে সাহায্যকারী কেউ এসেছে ?

বাবর ইশারা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার পরিস্থিতি তৈরি হলো। সিঙ্গা বাজানো হলো। বাদশাহের প্রিয় পিতজুচাক ঘোড়া নিয়ে একজন ছুটে এল। বাদশাহ তখ্‌ত্‌ রওয়ান ছেড়ে ঘোড়ায় উঠলেন। দূরে ধুলার ঝড় ঘন হচ্ছে। সৈন্যসংখ্যা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রোদে ঘোড়ার আরোহীদের শিরস্ত্রাণ ঝলসে ঝলসে উঠছে।

বাবরের সংবাদ সরবরাহ্‌ দলের চারজন ঘোড়সওয়ার ছুটে যাচ্ছে। তাদের হাতে আয়না। তারা আয়নার আলো ফেলে বোঝার চেষ্টা করবে কারা এসেছে।

সম্রাট বাবরের চোখমুখ শক্ত। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সহজ হলো। তিনি শরবতের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে কে আসছেন তিনি জানেন। আসছে পুত্র হুমায়ূন মীর্জা।

যুদ্ধাবস্থার তাতে পরিবর্তন হলো না। সম্রাটদের পুত্র থাকে না, ভাই থাকে না। তারা সবসময়ই একা। হুমায়ূন যে সসৈন্যে তাকে আক্রমণ করতে আসছে না এর নিশ্চয়তা কোথায় ? হুমায়ূন মীর্জার অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে। আগ্রা দুর্গ দখল করার জন্যে পাঁচ শ' অশ্বারোহীর একটি বিশেষ দল সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে। বাবর বিড়বিড় করে নিজের রচনা চারপদী কবিতা আবৃত্তি করলেন—

সম্রাটের বন্ধু তার সুতীক্ষ্ণ তরবারি
এবং তার ছুটন্ত ঘোড়া আর তার বলিষ্ঠ দুই বাহু
তার বন্ধু নিজের বিচার
এবং পঞ্জরের অস্থির নিচের কম্পবান হৃদয়

হুমায়ূন মীর্জা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন। তিনি বাবার সামনে এসে নতজানু হয়ে দাঁড়ালেন। তার হাতে নীল রেশমি রুমালে কী যেন লুকানো। বাঁ হাতে রুমাল রেখে ডান হাতে তিনি নিজের কপাল স্পর্শ করে সেই হাতে ভূমি স্পর্শ করলেন। তিনবার এই কাজটি করে কুর্নিশ পর্ব শেষ করা হলো।

বাবর বললেন, পুত্র, তোমার হাতে কী ?

হুমায়ূন বললেন, সামান্য উপহার।

পিতার প্রতি পুত্রের উপহার কখনোই সামান্য না।

হুমায়ূন বললেন, অতি মহার্ঘ উপহারও মহাপুরুষের কাছে সামান্য।

বাবর প্রীত হলেন। কবিতার এই চরণটি তাঁর লেখা। পুত্র মনে করে রেখেছে এবং সময়মতো বলতে পেরেছে। বাবর বললেন, উপহার দেখাও।

হুমায়ূন মীর্জা রেশমি রুমাল খুললেন। তার হাতে পায়রার ডিমের চেয়েও বড় একটা হীরা। সূর্যের আলো হীরাতে পড়েছে। মনে হচ্ছে হাতে আগুন লেগে গেছে। বাবর মুগ্ধ গলায় বললেন, বাহ্!

হুমায়ূন মীর্জা বললেন, এই হীরার নাম কোহিনুর। এর ওজন আট মিস্কাল্। বলা হয়ে থাকে এই কোহিনূরের মূল্যে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ দু'দিন পানাহার করতে পারবে।

এটা কি সেই কোহিনূর যা সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি ভারতে এনেছিলেন ?

এটি সেই কোহিনূর। আপনি হাতে নিলে আমি খুশি হব।

সম্রাট বাবর হীরকখণ্ড হাতে নিলেন। মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, পুত্র তোমার উপহার পেয়ে আমি খুশি

হয়েছি। এতই খুশি হয়েছি যে এই কোহিনূর তোমাকেই আমি উপহার হিসেবে দিচ্ছি। পিতার উপহার গ্রহণ করো।

বাবর লক্ষ করলেন হুমায়ূনের চোখ ছলছল করছে। এ-কী! এত অল্পতে তার ছেলের চোখে পানি আসছে কেন ? একদিন সে সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করবে। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে রাজদূতরা এসে তাকে কুর্নিশ করে বলবে, বাদশাহ নামদার। তাকে হতে হবে ইস্পাতের মতো কঠিন।

সম্রাট বাবরের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। তিনি উঁচু গলায় বললেন, পুত্র শোনো। শুধু এই হীরক খণ্ড না, ইব্রাহিম লোদীর রাজকোষের সম্পূর্ণ অর্থ আমি তোমাকে উপহার দিলাম। বলো, মার্‌হাবা।

মার্‌হাবা।

হুমায়ূন মীর্জা এর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর পিতার দিল্লীর কোষাগার দখল করে রাজকোষের সব অর্থ নিয়ে পালিয়ে গেলেন বাদাখ্‌শানের দিকে। আগস্ট মাস, ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ। এই কাজ তিনি কেন করলেন তা এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের কাছে রহস্যাবৃত।

সম্রাট বাবর তাঁর স্ত্রী মাহিম বেগমের সঙ্গে খেতে বসেছেন। সম্রাট খাচ্ছেন, মাহিম বেগম একটির পর একটি বাটি এগিয়ে দিচ্ছেন। সব খাবারই পরীক্ষা করা, তারপরেও স্বামীর পাত্রে খাবার দেওয়ার আগে নিজে চেখে দিচ্ছেন। বাবর বললেন, তোমার পুত্র যে আমার রাজকোষ লুট করে পালিয়ে গেছে এটা জানো ?

জানি।

কাজটা সে কেন করেছে জানো ?

জানি না।

তার কি শাস্তি হওয়া উচিত ?

উচিত। তবে আপনি দয়ালু পিতা। হুমায়ূন মীর্জা আপনার অতি আদরের প্রথম সন্তান।

বাবর বললেন, সম্রাটের কোনো পুত্র থাকে না। স্ত্রী থাকে না। আত্মীয়-পরিজন থাকে না। সম্রাটের থাকে তরবারি।

আপনার থাকে। কারণ আপনি অন্য সম্রাটদের মতো না। আপনি আলাদা।

আমি প্রধান উজির মীর খলিফার সঙ্গে পরামর্শ করেছি। প্রধান উজির হুমায়ূন মীর্জাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার পক্ষে। কঠিন শাস্তি দেওয়া হলে তার ভাইরা সাবধান হবে। অন্য রাজপুরুষরাও সাবধান হবে।

মাহিম বেগম চুপ করে রইলেন। বাবর বললেন, প্রধান উজির হুমায়ূন মীর্জার মৃত্যুদণ্ড শাস্তির পক্ষে। হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে মৃত্যু।

মাহিম বেগম বললেন, প্রধান উজির কী বলছেন তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। আপনি কী ভাবছেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

বাবর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অদ্ভুত এই হাসি দেখে হঠাৎ মাহিম বেগমের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

হুমায়ূন মীর্জা বাদাখ্‌শানের পথে। এখন যাত্রাবিরতি। রাজকীয় তাঁবু ফেলা হয়েছে। তিনি গরমে অতিষ্ঠ। স্নানের বাসনা প্রকাশ করেছেন। স্নানপাত্রে পানি ঢালা হচ্ছে। গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো হচ্ছে। আট ভাগ পানির সঙ্গে এক ভাগ গোলাপের পাপড়ি মেশানো হবে। পানিতে সামান্য কর্পূরও দেওয়া হবে। কর্পূর মেশানো পানিতে দৈত্যাকৃতি পাখা দিয়ে হাওয়া দেওয়া হবে। এই হাওয়ায় কর্পূর উড়ে গিয়ে পানি দ্রুত শীতল হবে।

হুমায়ূন মীর্জার হাতে রঙতুলি এবং চীন দেশ থেকে আনা শক্ত তুলট কাগজ। তিনি আগ্রহ নিয়ে একটা পাখির ছবি আঁকছেন। পাখির পালক

ঘন নীল। ঠোঁট এবং পা লাল। পাখিটা মনের আনন্দে তাঁর তাঁবুর পাশেই ঘুরছে। জনসমাগম দেখে ভয় পাচ্ছে না। কেউ এর নাম-পরিচয় বলতে পারছে না। হুমায়ূন মীর্জার সার্বক্ষণিক সঙ্গী দু'জন চিত্রকর এবং একজন হরবোলা পাখির পরিচয় বের করার চেষ্টায় আছে। চিত্রকরদের একজন হুমায়ূন মীর্জার ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে পাখি-বিষয়ক বই নিয়ে এসে পাতা ওল্টাচ্ছেন। অন্যজন হুমায়ূন মীর্জার মতোই পাখির ছবি আঁকছেন। যেন পরে ছবি দেখে পাখির পরিচয় পাওয়া যায়। হরবোলা অপেক্ষা করছে কখন পাখি ডেকে ওঠে। একবার ডাকলেই হরবোলা বাকি জীবন এই ডাক মনে করে রাখবে। পাখি এখনো ডাকছে না।

রাত অনেক হয়েছে।

সম্রাট বাবর ঘুমাবার প্রস্তুতি নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকেছেন। ইয়েমেন থেকে আনা হালকা সৌরভের আগরবাতি জ্বলছে। হাবশি খোজারা টানাপাখা টানছে। বড় বড় মাটির পাত্রে পানি রাখা আছে। তাদের গায়ে বাতাস পড়ায় ঘর শীতল। হিন্দুস্থানের অতি গরম আবহাওয়া বাবর এখনো সহ্য করে উঠতে পারেন নি। গরমের রাতগুলিতে প্রায়ই তাকে অঘুম কাটাতে হয়।

মাহিম বেগম ঘরে ঢুকে সম্রাটকে কুর্নিশ করলেন। সম্রাট স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। রাজকোষ লুণ্ঠনের অপরাধে তোমার পুত্রের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম। তাকে ধরে আনার জন্যে আমার বিশাল সেনাবাহিনী আগামীকাল প্রত্যুষে যাত্রা করার কথা। কিছুক্ষণ আগে আমি তোমার পুত্রকে ক্ষমা করেছি।

মাহিম বেগম কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সম্রাট যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি সম্রাটের পায়ে চুম্বন করতে আগ্রহী।

অনুমতি দিলাম।

মাহিম বেগম সম্রাটের পায়ে মুখ ঘষতে লাগলেন। সম্রাট সামান্য চমকালেন। এই দৃশ্যের সঙ্গে কি তাঁর দুঃস্বপ্নের কোনো মিল আছে ? স্বপ্নে একটা পঙ্গু ভেড়া এই ভঙ্গিতেই তার পায়ে মুখ ঘষছিল। মাহিম বেগম তার অতি আদরের স্ত্রী। হুমায়ূন মীর্জার মাতা।

মাহিম বেগম বললেন, কাবুলের দুর্গে হুমায়ূন মীর্জার জন্ম হয়। তাকে দেখতে এসে আপনি খুশি হয়ে আমাকে এক শ' আশরাফি উপহার দেন। তখন আমি আপনাকে কী বলেছিলাম আপনার কি মনে আছে ?

সম্রাট ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মনে আছে। তুমি বলেছিলে স্বর্ণমুদ্রার আমার প্রয়োজন নাই। আপনি শুধু পুত্রের গায়ে হাত রেখে বলবেন, আপনি তার উপর কখনো রুষ্ট হবেন না। শোনো মাহিম বেগম, আমি সেই প্রতিজ্ঞা কিন্তু করি নাই। যাই হোক অনেকক্ষণ পায়ে মাথা রেখেছ এখন মাথা তোল।

মাহিম বেগম বললেন, আপনার কিছু বিষয় আমি বুঝি না। আপনার পরম শত্রু ইব্রাহিম লোদী পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত। এই ইব্রাহিম লোদীর মা'কে আপনি রাজ-অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছেন। কারণ জানতে পারি ?

পার। এই মহিলা কোনো অপরাধ করেন নি। নিহত পুত্রের চেহারা দেখে শোকে অধীর হয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি দয়া করব না!

আপনি অবশ্যই করবেন। আপনাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করাই আমার অন্যায় হয়েছে।

(ইব্রাহিম লোদীর মা প্রথম সুযোগেই বাবরকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেন। তাঁর এই অপরাধও ক্ষমা করা হয়।)

৪র্থ জিল্‌কদ্‌ ৯১৩ হিজরির * মঙ্গলবার রাতে নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন মীর্জা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার দিক থেকে তৈমুরের পঞ্চম অধস্তন এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের পঞ্চদশ পুরুষ।

নাসিরুদ্দিন মোহম্মদ হুমায়ূন মীর্জা নামের আবজাদ (আরবি অক্ষর থেকে নামের সংখ্যা মান বের করা। অনেকটা নিউমরোলজির মতো।) সংখ্যা ৯১৩।

আমি *বাদশাহ নামদার* গ্রন্থে ৯১৩ আবজাদ সংখ্যায় সম্রাট হুমায়ূনের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করব। এই কাহিনীতে ঔপন্যাসিকের রঙ চড়ানোর কিছু নেই। সম্রাট হুমায়ূন অতি বিচিত্র মানুষ। ভাগ্য বিচিত্র মানুষ নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। ভাগ্য তাঁকে নিয়ে অদ্ভুত সব খেলা খেলেছে।

আসুন আমরা বাদশাহ নামদারের জগতে ঢুকে যাই। মোঘল কায়দায় কুর্নিশ করে ঢুকতে হবে কিন্তু।

নকিব বাদশাহর নাম ঘোষণা করছে—

> আল সুলতান আল আজম ওয়াল খাকাল আল মুকাররাম, জামিই সুলতানাত-ই-হাকিকি ওয়া মাজাজি, সৈয়দ আল সালাতিন, আবুল মোজাফফর নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ূন পাদশাহ, গাজি জিল্লুল্লাহ।

---

*ইংরেজি ৬ মার্চ, ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ

এগারো সংখ্যাটি সম্রাট বাবরের প্রিয়। তিনি যখন শরাব পানের আসরে বসেন, তখন তাঁর সঙ্গী থাকে দশজন। খাবার খেতে যখন বসেন তখনো দশজনকে নিয়েই বসেন। তাঁকে নিয়ে সবসময় সংখ্যা হয় এগারো। বেজোড় সংখ্যা। আল্লাহপাক বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন।

প্রভাতী মদ্যপানের আসর বসেছে। এই আসরের নাম সাবহী (প্রভাত মদ্য)। যথারীতি দশজন আমীর আছেন। তাদের সামনে রুপার পানপাত্র। সম্রাটের সামনে স্বর্ণের পানপাত্র। তারা 'দমীহ্' নামের শরাব খাচ্ছেন। 'দমীহ্' এসেছে পারস্য থেকে। এক বিশেষ ধরনের গাছের শিকড় এবং মধু থেকে দমীহ্ তৈরি হয়। দমীহ্ কিছুক্ষণের মধ্যে নেশার আবেশ তৈরি করে, তবে সহজে মত্ততা আনে না।

পান শুরু হওয়ামাত্র প্রধান উজির মীর খলিফা ঢুকলেন। সম্রাটের ভুরু কুঞ্চিত হলো। মীর খলিফা ধর্মীয় অনুশাসন কঠিনভাবে মানেন। শরাব খান না। পানের আসরে এ ধরনের মানুষের উপস্থিতি সম্রাটের পছন্দ না।

মীর খলিফা বললেন, আমি সম্রাটের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে আগ্রহী।

সম্রাট বললেন, উজির, আপনার সময় নির্বাচন ভুল হয়েছে।

উজির বললেন, সময়ের ভুল শুদ্ধ নেই। মানুষ ভুল শুদ্ধের অধীনে বাস করে। সময় করে না।

এই মুহূর্তে একান্তে কথা বলা জরুরি?

জরুরি।

যাঁরা আমার সঙ্গে আছেন তাঁরা আমার আপনজন। আমাকে যা বলা যাবে, তাঁদেরকেও বলা যাবে।

উজির বললেন, আমার যা বলার তা আমি আপনাকেই বলব। আপনার ইচ্ছা হলে পরে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। এখন না।

সম্রাট হাত ইশারা করতেই আমীররা উঠে গেলেন। তাদেরকে বিচলিত মনে হলো।

উজির বললেন, কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছি হুমায়ূন মীর্জা তাঁর সমস্ত সেনাদল নিয়ে আগ্রার দিকে ছুটে আসছেন।

হুঁ।

বাদাখ্‌শান্‌ অরক্ষিত। হুমায়ূন মীর্জা বাদাখ্‌শান্‌ সুরক্ষার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই করেন নি।

হুঁ।

কামরান মীর্জার সঙ্গে হুমায়ূনের কাবুলে দেখা হয়েছে। কামরান তাঁর বড়ভাইয়ের হঠাৎ করে আগ্রা রওনা হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। হুমায়ূন কোনো জবাব দেন নি।

হুঁ।

বাদাখ্‌শান্‌ অরক্ষিত রেখে হুমায়ূন হিন্দুস্তান যাত্রা করেছেন দেখে কামরান যাচ্ছেন বাদাখ্‌শানে। তিনি বাদাখ্‌শানের দুর্গ রক্ষা করবেন।

হুঁ।

এদিকে অরক্ষিত বাদাখ্‌শানের দখল নেওয়ার জন্যে আপনার চিরশত্রু সুলতান সঈদ খান রওনা হয়ে গেছেন। আমার যা বলার ছিল

বলেছি। আপনার প্রভাতী পানাহারের বিঘ্ন করেছি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বাবর দমীহ্‌তে চুমুক দিলেন। তাঁকে তেমন বিচলিত মনে হলো না। তিনি হালকা গলায় বললেন, হুমায়ূন হঠাৎ কেন এদিকে আসছে বলে আপনার ধারণা ? সে কি সিংহাসন চায় ?

মীর খলিফা বললেন, সিংহাসন চাওয়াটাই স্বাভাবিক। ধরে নিলাম সিংহাসন তার চিন্তায় নেই, তারপরেও আপনাকে কিছু না জানিয়ে বাদাখ্‌শান্‌ অরক্ষিত রেখে তার যাত্রা গর্হিত হয়েছে।

সম্রাট বললেন, এমনও তো হতে পারে হঠাৎ এদিকে আসার তার বিশেষ কোনো কারণ ঘটেছে।

উজির শীতল গলায় বললেন, সম্রাটকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আপনার এই পুত্র দিল্লীর রাজকোষ লুণ্ঠন করে পালিয়ে গিয়েছিল।

হুঁ।

আপনি তিল তিল করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছেন। যোগ্য হাতে এই সাম্রাজ্য রক্ষার ভার দিয়ে যাওয়া আপনার কর্তব্য।

আপনার কাছে যোগ্য কে বলে মনে হয় ?

অবশ্যই কামরান মীর্জা। হুমায়ূন মীর্জা অলস এবং আরামপ্রিয়।

হুঁ।

সম্রাটকে জানাতে চাই, প্রধান উজির হিসেবে সম্রাটের সেবা এবং সাম্রাজ্যের সেবা ছাড়া আমার কোনো উদ্দেশ্য নাই। অতীতেও ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না।

উজির ভক্তিভরে সম্রাটের হাতে চুম্বন করলেন। সম্রাট বললেন, আপনি কখনোই আমাকে কোনো ভুল পরামর্শ দেন নাই। আপনার কর্মে আমি উপকৃত, আমার সাম্রাজ্য উপকৃত।

মীর খলিফা বললেন, আপনাকে এই মুহূর্তে আমি একটি পরামর্শ দিতে চাচ্ছি। আপনি বিচক্ষণ সম্রাট, আমার এই উপদেশ গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন।

কী পরামর্শ ?

রাজকীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী হুমায়ূন মীর্জার গতিরোধ করবে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করবে। আপনি তাঁকে প্রশ্ন করবেন এই সময়ে বাদাখ্‌শান্‌ শক্রর হাতে ফেলে তিনি কেন চলে এসেছেন ?

আপনার ধারণা এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ?

অবশ্যই এটি সঠিক সিদ্ধান্ত।

সম্রাট বাবর বললেন, সঠিক সিদ্ধান্তের ক্ষমতা আছে শুধুই আল্লাহ্‌পাকের। মানুষকে মাঝে মাঝে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে সে মানুষ। হুমায়ূন মীর্জা যেন নির্বিঘ্নে দিল্লী আসতে পারে এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হলো।

উজির কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হতাশ গলায় বললেন, সম্রাটের আদেশ এই দাসানুদাসের শিরোধার্য।

মীর খলিফা উঠে যাওয়ার পর ভগ্ন পান-উৎসব আবার শুরু হলো। উজবেকিস্তানের এক গায়িকা আসহারির জাদুকরী কণ্ঠের কথা সম্রাট শুনেছেন। তার গান শোনা হয় নি। প্রভাতী পান-উৎসবে গায়ক-গায়িকাদের কখনো আনা হয় না। সম্রাটের ইচ্ছায় আজ আসহারিকে আনা হলো। সে কিন্নর কণ্ঠে তুর্কী ভাষায় গান ধরল—

> "গোলাপকুঁড়ির মতো আমার হৃদয়
> তার দলের উপর রক্তের ছাপ,
> লক্ষ বসন্তও আমার সে হৃদয়ের ফুল
> কুঁড়ি ফোটাতে পারে না।"

গান শুনে সম্রাট অভিভূত হলেন। প্রথমত, গায়িকার অলৌকিক কণ্ঠ। দ্বিতীয়ত, এই গানের চরণগুলি তাঁর লেখা। তাঁর চরণেই সুর বসানো হয়েছে।

সম্রাট বললেন, তোমার নাম ?

বাঁদির নাম আসহারি।

গানের চরণগুলি কার রচনা তুমি জানো ?

জানি জাহাঁপনা।

সুর কে করেছে ?

আপনার সামনে উপস্থিত এই বাঁদি করেছে।

আমার কাছ থেকে উপহার হিসাবে কী চাও ?

মাঝে মাঝে আপনাকে গান শোনানোর সুযোগ চাই।

সম্রাটের চোখে পানি এসে গেল। তিনি ঘোষণা করলেন এই গায়িকাকে ওজন করে সমওজনের স্বর্ণমুদ্রা যেন তৎক্ষণাৎ দেওয়া হয়।*

হুমায়ূন মীর্জা বাবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ পথশ্রমে হুমায়ূন ক্লান্ত, কিন্তু তার চোখ চকচক করছে। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। বাবর বললেন, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছ ? সম্রাটের সামনে, না একজন পিতার সামনে ?

আমি আমার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

তাহলে তুমি তোমার বাবাকে জড়িয়ে ধরছ না কেন ?

হুমায়ূন সম্রাট বাবরকে জড়িয়ে ধরলেন। পুত্রের সঙ্গে পিতার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা সম্রাট বাবর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বাবরনামা*-য় এইভাবে

---

* গায়িকাকে ওজন করে সমওজনের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয় নি। দেওয়া হয়েছিল তাম্রমুদ্রা। আমীররা সবাই খাজাঞ্জিকে বলেছেন, সম্রাট তাম্রমুদ্রা বলতে গিয়ে নেশার ঝোঁকে স্বর্ণমুদ্রা বলে ফেলেছেন।

দিয়েছেন—"হুমায়ূনের উপস্থিতিতে ফুলের মুকুলের মতো আমার হৃদয় ফুটে উঠল। আমাদের চোখ আনন্দে মশালের মতো জ্বলে উঠল।

আমি রোজ দশজনকে নিয়ে খানা খেতাম, এদিন হুমায়ূনের সম্মানে আমি একটা ভোজের আয়োজন করলাম। আমরা পরম ঘনিষ্ঠভাবে কিছুকাল একসঙ্গে রইলাম। সত্যি বলতে কী, তার আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার একটা আশ্চর্য মনোজ্ঞ আকর্ষণ ছিল। একজন পূর্ণ মানুষ বলতে যা বোঝায় সে তখন তা-ই ছিল।" (Pavet de Courteille-র অনুবাদ। *বাবরনামা*-র বিক্ষিপ্ত অংশ।)

নৈশভোজনের পর পিতার সঙ্গে পুত্রের কিছু কথাবার্তা হলো। সম্রাটের খাসকামরায় গোপন বৈঠক। খাসকামরার দরজা-জানালা বন্ধ। ভারী পর্দা নামানো। খাসকামরার বাইরে ছ'জন খোজা প্রহরী। তারা সবাই বধির। যেন গোপন আলোচনার বিষয় তারা শুনতে না পারে। জন্ম থেকে মূক ও বধিরদের প্রহরী পদ দেওয়া হয় না। সুস্থ-সবল খোজা প্রহরীদের কান নষ্ট করে এই পদ দেওয়া হয়।

সম্রাট পুত্রকে কিছু শক্ত কথা বললেন।

বাবর : তুমি বাদাখ্‌শান্‌ অরক্ষিত রেখে চলে এলে কেন ?

হুমায়ূন : এক রাতে হঠাৎ আপনাকে দেখার প্রবল ইচ্ছা হলো। পরদিনই আমি যাত্রা করলাম।

বাবর : তোমার কি ধারণা কাজটা ঠিক হয়েছে ?

হুমায়ূন : হ্যাঁ। পুত্রের কাছে পিতা বড়। সাম্রাজ্য বড় না।

বাবর : মনেপ্রাণে এই কথা বিশ্বাস করো ?

হুমায়ূন : করি।

বাবর : পিতাকে দেখতে চেয়েছিলে দেখা হয়েছে। এখন বাদাখ্‌শানে ফিরে যাও। দুর্গ রক্ষা করো।

হুমায়ূন : না।

বাবর : তুমি কি না বলেছ ?

হুমায়ূন : বেয়াদবির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সম্রাট আদেশ করলে আমি এই মুহূর্তেই রওনা হব। কিন্তু আমি আমার পিতার আশপাশে থাকতে চাই। আপনার যদি মনে হয় আমার কর্মকাণ্ডের পেছনে আছে সিংহাসনে বসার লোভ তাহলে ভুল হবে। সিংহাসন আমি চাই না।

বাবর : কেন চাও না ?

হুমায়ূন : যুদ্ধ, হত্যা, রাজ্যদখল এইসবে আমার আসক্তি নাই। আমি একা থাকতে পছন্দ করি, আমি পড়াশোনা করতে পছন্দ করি।

বাবর : খবর পেয়েছি তুমি আফিমের নেশা করছ ?

হুমায়ূন : হ্যাঁ।

বাবর : এই ভয়ঙ্কর নেশায় আসক্ত হয়েছ কেন ?

হুমায়ূন : আফিম খেলে আমি আশপাশের সবকিছু ভুলে থাকতে পারি।

বাবর : আফিম ছেড়ে দাও। এটা সম্রাটের আদেশ না, পিতার আদেশ। আর যেহেতু তুমি আমার আশপাশে থাকতে চাচ্ছ, আমি তোমাকে সম্বর যেতে বলছি। এখান থেকে কাছে। ইচ্ছা করলেই আমার কাছে চলে আসতে পারবে।

হুমায়ূন : আপনার অনুমতি যেদিন পাব সেদিনই রওনা হব। আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।

বাবর : বলো।

হুমায়ূন : কোহিনূর হীরা আমি আপনাকে দিতে চাই। আপনি গ্রহণ করলে আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হবে। হীরাটা আমার সঙ্গেই আছে।

বাবর : তোমার উপহার আমি গ্রহণ করলাম।

হুমায়ূন : আপনাকে নিয়ে এই অক্ষম অভাজন একটি কবিতা লিখেছে।

বাবর : পড়ে শোনাও।

হুমায়ূন : আমার ভগ্নি গুলবদন কবিতাটি আপনাকে পড়ে শোনাবে।

বাবর : তুমি শোনাবে না কেন ?

হুমায়ূন : আপনার সামনে লজ্জাবোধ করছি।

বাবর : প্রথম চরণটি বলো।

হুমায়ূন : 'প্রদীপ্ত সূর্য ছিল আমার পিতার কাছে ম্লান।'

হুমায়ূন সত্বর ফিরে গেলেন এবং তাঁর স্বভাবমতো ডুব মারলেন। যে বাবাকে দেখার জন্যে এত দূরে ছুটে আসা, সেই বাবার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই।

বাবর খবর পেয়েছেন, তার পুত্র বাগানের ভেতর একটা দোতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় থাকেন। একটা জানালার সামনে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখা যায়। প্রচুর পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকেন। ছবি আঁকায় একজন হাবশি (খোজা) চিত্রকর তাঁকে সাহায্য করে।*

চার মাস পার হয়ে গেল। এই চার মাসে সম্রাট বাবর পুত্রকে দু'বার আসতে বললেন। হুমায়ূন মীর্জা বেয়াদবির চূড়ান্ত করলেন, চিঠির জবাব দিলেন না।

বাবর সিংহাসনে। দিনের প্রথমার্ধের রাজকার্য শুরু হয়েছে, এই সময় খবর এল পুত্র হুমায়ূন এসেছেন। সম্রাট বললেন, তাকে এক্ষনি এই মুহূর্তে রাজসভায় উপস্থিত হতে বলো।

---

* মোঘল চিত্রকলার শুরু হুমায়ূনকে দিয়ে।

দূত ভীত গলায় বলল, হুমায়ূন মীর্জার পক্ষে সম্ভব না। তিনি অপারগ।

কেন?

তিনি অচেতন অবস্থায় আছেন। তাঁর জীবনসংশয়।

সম্রাট বাবর রাজসভা ভেঙে দিয়ে ছুটে গেলেন পুত্রকে দেখতে। কোথায় হুমায়ূন মীর্জা? দেখে মনে হচ্ছে একজন মৃত মানুষ পড়ে আছে।

হুমায়ূন মীর্জার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বললেন, উনি চিকিৎসার অতীত। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌পাক তাঁর গোপন ভাণ্ডার থেকে যদি কিছু দেন তবেই হুমায়ূন মীর্জার জীবনরক্ষা হবে।

দিল্লীর চিকিৎসকদের সভা বসল। তাঁরাও বললেন, সম্রাটপুত্র আমাদের চিকিৎসার অতীত। তাঁর জন্যে আল্লাহ্‌পাকের কাছে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, এর বেশি কিছু করতে পারি না।

সুফি সাধক মীর আবুল কাশিম তখন সম্রাটকে বললেন, পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে আপনি যদি আপনার অতি প্রিয় কিছু দান করেন তাহলে হয়তো-বা শাহজাদার জীবন রক্ষা হতে পারে।

বাবর বললেন, আমার কাছে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। আমি শাহজাদার জন্যে আমার প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

হতভম্ব মীর আবুল কাশিম বললেন, সম্রাট আপনি এটা কী বললেন? এই কাজ আপনি করতে পারেন না। আপনি বরং কোহিনূর হীরা দান করে দিন।

বাবর বললেন, আমার পুত্রের জীবনের দাম কি সামান্য একখণ্ড হীরা?

অচেতন হুমায়ূন মীর্জা বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। ঘরের ভেতরে তিনটা প্রদীপ জ্বলছে। সম্রাট বাবর ছাড়া

শাহজাদার সঙ্গে আর কেউ নাই। বাবর পুত্রের মাথার পাশ থেকে ঘুরতে শুরু করলেন। তিনি মনে মনে বলছেন, পুত্রের ব্যাধি আমি আমার শরীরে ধারণ করলাম। পরম করুণাময়, তুমি আমার পুত্রকে সুস্থ করে দাও। সম্রাট তিনবার চক্কর দেওয়ার পর পর অচেতন হুমায়ূন চোখ মেলে বললেন, বাবা। আপনি এখানে কী করছেন?

পুত্রের কালান্তক ব্যাধি শরীরে ধারণ করে পঞ্চাশ বছর বয়সে সম্রাটের মৃত্যু হয়। ৬ জমাদিয়াল আউয়াল ৯৩৭ হিজরি, ইংরেজি ২৬ ডিসেম্বর, ১৫৩০। তার তিন দিন পর হুমায়ূন মীর্জা সিংহাসনে বসেন।

সম্রাট হুমায়ূনের বাম হাতে একটি অদ্ভুত সুন্দর হালকা নীল রঙের বৈদুর্যমণি (Lapis Lazuli)। ডান হাতে একটি চিঠি। চিঠি পাঠিয়েছেন রাজস্থান থেকে রাজপুত রানী কর্ণাবতী। চিঠির সঙ্গে কয়েকগাছি হলুদ সুতা।

সম্রাট চিঠি পড়ছেন না। চিঠি এবং বৈদুর্যমণি এক হাত থেকে আরেক হাতে চালাচালি করছেন। যখন চিঠি ডান হাতে তখন বৈদুর্যমণি বাম হাতে। দৃশ্যটি সম্রাটের দুই ভগ্নি গুলবদন এবং গুলচেহ্‌রা চিকের আড়াল থেকে দেখে মজা পাচ্ছে। দরবার চলাকালে এই দুই বোন চিকের আড়াল থেকে দরবারের কাজকর্ম দেখে। সম্রাটের অন্তঃপুরের আত্মীয়স্বজনদের রাজদরবার দেখার জন্যেই চিকের ব্যবস্থা। যারা দেখবে তারা দরবারের লোকজনের কাছে অদৃশ্য।

প্রধান উজির বললেন, সম্রাট কি কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত ?

সম্রাট হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

চিন্তার বিষয় কি জানতে পারি ?

হ্যাঁ পারেন। জাদুবিদ্যার বইটি এখানো জোগাড় করা গেল না। এই নিয়ে আমি চিন্তিত।

সম্রাট *হিন্দুস্থানের জাদুবিদ্যা* নামের একটি বইয়ের সন্ধান পেয়েছেন। বইটি আছে তাঁর ছোটভাই কামরান মীর্জার কাছে। সে সংগ্রহ করেছে কান্দাহারের এক দুর্গ থেকে।

সম্রাট হুমায়ূনের এই বইটি পড়ার খুব ইচ্ছা। বইটি নাকি লেখা হয়েছে প্যাঁচার রক্ত দিয়ে। দিনের বেলা বইয়ের লেখা অস্পষ্ট থাকে, রাতে স্পষ্ট হয়। সম্রাট তাঁর ভাইয়ের কাছে বইটি চেয়ে পত্র দিয়েছেন। কামরান মীর্জা পত্রের জবাব দেন নি।

উজির বললেন, রানী কর্ণাবতীর পত্রটি কি আপনি পড়বেন ? গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

সম্রাট চিঠি পড়তে শুরু করলেন—

আমি আপনাকে 'ভাই' ডাকলাম। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী ভাইকে রাখি পাঠালাম। আমি মহাবিপদে পড়েছি। গুজরাটের বাহাদুর শাহ আমার দুর্গ অবরোধ করেছেন। দুর্গ রক্ষার প্রয়োজনীয় শক্তি আমার নেই। দুর্গে এক হাজার রাজপুত রমণী এবং তিন হাজার শিশু আছে। বাহাদুর শাহ দুর্গে প্রবেশ করলে আমাদের মৃত্যুবরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

এখন বোন ভাইকে ডাকছে। ভাই কি বোনকে উদ্ধার করবে ?

বোন ভাইয়ের জন্যে একটি বৈদুর্যমণি পাঠিয়েছে। কারণ বোন শুনেছে তার ভাই ছবি আঁকেন। বৈদুর্যমণি চূর্ণ করে যে নীল রঙ হবে তার দ্যুতি অসাধারণ। বোন কর্ণাবতী আশা করছে তার ভাই এই রঙ ব্যবহার করে একটা ছবি আঁকবে।

ইতি
রানী কর্ণাবতী

সম্রাট চিঠিটি তাঁর প্রধান উজিরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। প্রধান উজির চিঠি পড়ে বললেন, রত্ন পাঠিয়ে দিন রাজকোষে। চিঠির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ভাই বোনের চিঠির জবাব দেবে না ?

রানী কর্ণাবতী বিপদের বোন। বিপদে পড়েছেন বলেই ভাই পাতিয়েছেন। বিপদে না থাকলে এবং তাঁর শক্তি প্রবল থাকলে তিনি মোঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করতেও পিছপা হতেন না। তা ছাড়া আপনি নিজেও এখন মহাবিপদে আছেন।

কী রকম ?

আপনার ভাই কামরান মীর্জা শক্তি সঞ্চয় করছেন। তিনি পাঞ্জাব দখল করেছেন। তিনি যে-কোনো সময় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। একই কথা আপনার আরেক ভাই হিন্দাল মীর্জা সম্পর্কেও সত্যি। এদের চেয়েও অনেক বড় সমস্যা তৈরি করতে যাচ্ছে পাঠান শের খাঁ। সে বাংলা জয় করেছে। আগ্রার দিকে তার যাত্রা শুধু সময়ের ব্যাপার।

হুমায়ূন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হতে বলুন। আমি স্বয়ং চিতোরের দিকে রওনা হচ্ছি।

এই সিদ্ধান্ত সমরবিশারদদের সঙ্গে আলোচনার পর নিন।

সমরবিশারদরা আপনার মতোই কথা বলবে। কিন্তু আমি আমার বিপদগ্রস্ত বোনের পাশে দাঁড়াতে চাই।

শাহানশাহ্, রাজনীতিতে আবেগের স্থান নেই।

হুমায়ূন বললেন, আমার রাজনীতিতে আছে। একজনের চরম বিপদে আমি তার পাশে যখন দাঁড়াব, তখন দেখা যাবে আমার চরম বিপদেও কেউ একজন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।*

---

*হুমায়ূনের কথা সত্যি হয়েছিল। রাজ্যহারা পথের ফকির হুমায়ূনকে সাহায্য করেছিলেন পারস্য সম্রাট। সেখানেও একটি চিঠির ভূমিকা ছিল।

প্রধান উজির বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। সম্রাটের কোনো কর্মকাণ্ডই সম্রাটসুলভ না। তিনি বাস করেন সম্পূর্ণ নিজের জগতে। সেই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে সুরা, আফিম এবং কবিতা। তুরস্ক থেকে এক কবি এসেছে, রাজসভায় তাঁকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। কবির নাম দিদির আলী।

সম্রাট গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করাকে এখন রাজকার্যের অংশ ভাবছেন। সারাক্ষণ শুভ-সময় অশুভ-সময় নির্ণয় করে চলেছেন। তিনি পোশাকও পরছেন গ্রহ-নক্ষত্র বিবেচনা করে। রবিবারে পরছেন হলুদ পোশাক। সেদিন তিনি রাজ্য পরিচালনা-বিষয়ক সভা করেন।

সোমবার পরেন সবুজ পোশাক। ঐদিন তিনি আনন্দে থাকেন। রাজসভায় গীত-বাদ্য হয়।

মঙ্গলবারে লাল, মঙ্গলগ্রহের লাল রঙের পোশাক পরেন। সেদিন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মেজাজ থাকে উগ্র। সামান্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেন।

আজ মঙ্গলবার। সম্রাট লাল পোশাক পরেছেন। যুদ্ধযাত্রা ঘোষণা দেওয়ার এইটিই কি কারণ ?

প্রধান উজির আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সম্রাট তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তীর ধনুক নিয়ে আসুন। একটি তীরের আগায় বাহাদুর শাহর নাম লেখা থাকবে। আরেকটির আগায় আমার নাম। আমি নিজে তীর ছুঁড়ে দেখব কোনটি আগে যায়। যার তীর আগে যাবে, সে-ই যুদ্ধে জিতবে।

সম্রাটের তীর অনেক আগে গেল।

পরদিন (বুধবার) ফজরের নামাজের পর হুমায়ূন চিতোরের দিকে সসৈন্যে রওনা হলেন। দুপুরে এক হ্রদের পাড়ে সৈন্যরা দ্বিপ্রহরের খাবারের জন্যে থামল। তখন বাহাদুর শাহ্র বিশেষ দূত সম্রাট

হুমায়ূনের কাছে একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে লেখা—

সম্রাট হুমায়ূন,

অতি ভক্তিভরে নিবেদন করছি যে, আমি মোঘল সম্রাটের একজন দীন সেবক মাত্র। আমি বর্তমানে ধর্মযুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেছি। ওলেমারা রানী কর্ণাবতীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে 'জেহাদ' অ্যাখ্যা দিয়েছেন।

সম্ভবত আপনার কাছে তথ্য নাই যে, এই দুর্গে অনেক মুসলমান রমণী বন্দি অবস্থায় আছেন। রাজপুত পুরুষরা তাদের ব্যবহার করে।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের নৃত্যগীত এবং আরও অনেক অশ্লীল কুৎসিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়।

আমি অনুরোধ করব যে, আপনি এই যুদ্ধযাত্রা স্থগিত করবেন। আমি আপনার সম্মানে এক বাক্স মণিমুক্তা, চারটি আরবি ঘোড়া এবং একটি হাতি পাঠালাম। এই হাতিটা আমার প্রিয়, এর নাম কুশ।

ইতি
আপনার সেবক
বাহাদুর শাহ

হুমায়ূন যুদ্ধযাত্রা স্থগিত করলেন না। জোহরের নামাজের পর সেনাবাহিনী দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। বাহাদুর শাহ খবর পেলেন হুমায়ূন যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর

গোলন্দাজ বাহিনী। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান তকি খাঁ কামান চালনায় বিশেষ পারদর্শী। হুমায়ূনের বিশেষ কামান 'ফিরোজা'কে দু'টা হাতি টেনে নিয়ে আসছে। মাঝারি কামানগুলি টানছে মাদ্রাজি বলদ। বন্দুকধারীরা কামানের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কামান অগ্রসর হবে না, তবে বন্দুকধারীরা অগ্রসর হবে।

সম্রাটের তীরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্বে আছে আফগান তীরন্দাজ প্রধান শাহ জুম্মা। তাঁর সম্পর্কে কথিত আছে, লক্ষ্যবস্তু দেখার পর তিনি চোখ বন্ধ করে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারেন।

হুমায়ূনের অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। তারা অগ্রবর্তী তীরন্দাজ দলের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল।

বাহাদুর শাহ সম্রাট হুমায়ূনের দ্রুত এগিয়ে আসার খবর শুনলেন। তিনি পালিয়ে যাওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ করে দুর্গ অবরোধকারী সৈন্যদের উল্লাসধ্বনি করতে বললেন। দুর্গের বাইরে বিরাট হৈচৈ হতে লাগল।

রানী কর্ণাবতী বাইরে হঠাৎ হৈচৈ শুরু হয়েছে কেন জানতে চাইলেন। তাকে জানানো হলো বাহাদুর শাহর বাহিনীর সঙ্গে হুমায়ূন বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে হুমায়ূন পরাজিত হয়েছেন। হাতির পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন বলেই বাহাদুর শাহর শিবিরে আনন্দ উল্লাস।

জহরব্রত পালনের জন্যে আগুন প্রস্তুত ছিল। রানী কর্ণাবতী সবাইকে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রানীর আদেশে দুর্গের তিন হাজার শিশুকেও কুয়ায় নিক্ষেপ করা হলো। যেন এরা শত্রুর হাতে পড়ে নিগৃহিত না হয়।

বাহাদুর শাহ দুর্গে প্রবেশ করতে পারলেন না। হুমায়ূনের বাহিনী চলে এসেছে। তিনি পালিয়ে গেলেন।

রানী কর্ণাবতীর মৃত্যু হুমায়ূনকে দুঃখে অভিভূত করল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহাদুর শাহর পেছনে ছুটলেন। রানী কর্ণাবতীর মৃত্যু আরেকজনের মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি বাহাদুর শাহর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান রুমী খাঁ। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে হুমায়ূনের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

চিতোরের দুর্গ শ্মশান। দুর্গের বাইরে বাহাদুর শাহের অতি প্রিয় দুই হাতি বিকট চিৎকার করছে এবং ছোটাছুটি করছে। হুমায়ূনের হাতে বাহাদুর শাহর প্রিয় দুই হাতি পড়বে তা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না বলে নিজের হাতে এদের শুঁড় কেটে দিয়েছেন। হাতি দু'টির নাম শিরজা ও পতসিকার। বাহাদুর শাহর প্রসিদ্ধ দুই কামান লায়লা এবং মজনু যেন হুমায়ূনের হাতে না পড়ে সেই ব্যবস্থাও হলো। বাহাদুর শাহ নিজে কামান দুটি নষ্ট করলেন।*

বাহাদুর শাহ পালিয়ে মাণ্ডু দুর্গে আশ্রয় নিলেন।

হুমায়ূন মাণ্ডু পৌঁছালেন ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে। তিনি মাণ্ডু দুর্গ অবরোধ করলেন। সারা দিন ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি ছিলেন ক্লান্ত। এশার নামাজ শেষ করে সেনাপতিদের ডেকে বললেন, আমি জানি মাণ্ডু দুর্গ দখল করা কঠিন। কিন্তু আমি বাহাদুর শাহকে ধরতে চাই। এমন ব্যবস্থা করা হোক যেন রাতের ভেতর দুর্গ দখল হয়।

লম্বা লম্বা মই তৈরি করা হলো। মই দুর্গের গায়ে লাগিয়ে তীরন্দাজরা দুর্গপ্রাচীরে উঠে গেল। একদল তীরন্দাজ দুর্গের প্রধান দরজা খুলে দিল।

বাহাদুর শাহ দড়ি বেয়ে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন। দুর্গের ভেতরের মানুষজন কেউ বলল না, বাহাদুর শাহ কীভাবে পালিয়েছেন

---

* সূত্র : ডক্টর হরিশংকর শ্রীবাস্তব, *মোঘল সম্রাট হুমায়ূন*।

কোন দিকে যাচ্ছেন। হুমায়ূন তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, গাঢ় লাল রঙের পোশাক পরলেন। এর অর্থ, সবাইকে হত্যা করো।

ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো। মোঘল সৈনিকের তলোয়ারের নিচে হাজার হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হলো। সেদিন মঙ্গলবার হওয়ায় রক্তাম্বর পরে হুমায়ূন উন্মাদ হয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে তাঁর সৈন্যরাও উন্মাদ হয়ে গেল।

মাণ্ডুবাসীদের যে রক্ষা করে, তার কথা এখন বলা যাক। তার নাম বচ্ছু (মতান্তরে মঞ্জু)। এই বচ্ছু বাহাদুর শাহ'র অতি প্রিয় এক গায়ক। বাহাদুর শাহ যেখানে যান সেখানেই সে যায়।

রক্তাম্বর পরা সম্রাট হুমায়ূনের দিকে বচ্ছু গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল। গানের কথা—'রক্তের রঙের চেয়ে বৃক্ষের সবুজ রঙ কি কম সুন্দর ?...'

হুমায়ূন গায়কের কণ্ঠ শুনে অভিভূত হলেন। তাঁর কাছে মনে হলো, তিনি তাঁর জীবনে এত মধুর সঙ্গীত শোনেন নি। বচ্ছু সম্রাটের সামনে দাঁড়াল। সম্রাট বললেন, তুমি কি জানো যে তুমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক ?

বচ্ছু বলল, জানি।

আমি তোমার জাদুকরী ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছি। বলো কী চাও ?

আমি চাই আপনি পোশাক বদলে সবুজ পোশাক পরুন।

সম্রাট সবুজ বস্ত্র পরলেন। হত্যাযজ্ঞ সঙ্গে সঙ্গে থামল। সম্রাট বললেন, তুমি আর কী চাও ?

বচ্ছু বলল, যারা বন্দি আছে তাদের মুক্ত করে দিন।

হুমায়ূন বললেন, সবাই মুক্ত। আমি তোমার আরও একটি ইচ্ছা পূর্ণ করব। বলো কী চাও ?

আমি আমার গুরু বাহাদুর শাহের কাছে যেতে চাই।

হুমায়ূন দুর্গের প্রধান ফটক খুলে বচ্ছুকে চলে যেতে দিলেন। হুমায়ূনের প্রধান উজির বললেন, আপনি কী করছেন ?

সম্রাট বললেন, এই গায়ক যদি আমার রাজ্য প্রার্থনা করত আমি তাকে দিয়ে দিতাম।

মাণ্ডু থেকে পালিয়ে বাহাদুর শাহ আহমেদাবাদের চম্পানী দুর্গে অবস্থান নিলেন। মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। বাহাদুর শাহের গোলন্দাজবাহিনী কামান বসানোর আগেই সম্রাট হুমায়ূন চম্পানীর দুর্গ অবরোধ করলেন। বাহাদুর শাহ আবার পালালেন, তিনি আশ্রয় নিলেন কম্ব দুর্গে। হুমায়ূন এক ঘণ্টার মধ্যে কম্ব দুর্গে উপস্থিত হলেন।

কম্ব দুর্গ থেকেও বাহাদুর শাহকে পালাতে হলো। এবার তার সঙ্গে গায়ক বচ্ছু। পালাবার সময় তিনি বলেছিলেন, আমার সঙ্গে বচ্ছু আছে আমার আর কিছুই লাগবে না।

হুমায়ূন দুর্গের ভেতর মাগরেবের নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে তার ইমামকে ডেকে পাঠালেন। ইমামকে বললেন, মাগরেবের নামাজে আপনি সূরা ফিল পাঠ করেছেন ?

ইমাম বললেন, জি জনাব।

সূরা ফিলের শানে নজুল এবং তর্জমা আমাকে শোনান।

ইমাম বললেন, ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে নবীয়ে করিম (দঃ)-এর জন্মবর্ষের ঘটনার বর্ণনা নিয়ে এই সূরা নাযেল হয়। ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেছিলেন, তখন আল্লাহর আদেশে ছোট ছোট আবাবিল পাখি দিয়ে ইয়েমেনের বাদশাহকে পরাস্ত করা হয়েছিল। সূরা ফিলের এই হলো ঘটনা। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, হে রসুল! তুমি কি দেখো নি তোমার আল্লাহ হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করলেন ? তাদের সমস্ত আয়োজন কি আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন নি ?

সম্রাট বললেন, আপনি আমাকে ইয়েমেনের বাদশাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে এই সূরা পাঠ করেছেন ?

ইমাম বললেন, আমার ভুল হয়েছে।

সম্রাট বললেন, আপনি বাহাদুর শাহর অনুরক্ত বলেই এই কাজটি করলেন। কী আশ্চর্য, আমার প্রধান শত্রুর প্রতি যে অনুরক্ত, আমি তার পেছনে দিনের পর দিন নামাজ পড়েছি!

হুমায়ূন আবার রক্তপোশাক পরলেন। বাহাদুর শাহ তাঁকে যে হাতিটি দিয়েছেন কুশ তিনি সেই হাতি আনতে বললেন। হাতি হাজির করা হলো।

সম্রাট বললেন, আজ মাগরেবে যে সূরা পাঠ করা হয়েছে তার নাম ফিল অর্থাৎ হাতি। ইমাম, আপনার প্রিয় বাহাদুর শাহর দেওয়া সেই হাতির পায়ের চাপে পিষ্ট করে আমি আপনাকে হত্যার নির্দেশ দিলাম। এই আদেশ এশার নামাজের আগেই যেন কার্যকর হয়। *

নির্দেশ কার্যকর করা হলো।

কম্ব দুর্গ থেকে বাহাদুর শাহ্ পালিয়ে গেলেও তাঁর ধনরত্ন নিতে পারলেন না। সবই হুমায়ূনের হাতে পড়ল। ধনরত্নের বাইরে পেলেন বাহাদুর শাহের পোষা তোতাপাখি।

এই পাখি নাকি ভবিষ্যৎ বলতে পারে। রুমী খাঁকে সে যতবার দেখে ততবারই বলে, ফট রুমী হারামখোর। ফট রুমী হারামখোর। এর অর্থ হারামখোর রুমীর উপর অভিসম্পাত।

সম্রাটের প্রধান খেলা এখন হলো পাখির সঙ্গে সময় কাটানো। কম্ব বিজয়ের পর সম্রাট তোতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে শ্রেষ্ঠ আমি না

---

* ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, এই ঘটনার পর হুমায়ূন অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। তিনি সারা রাত একফোঁটা ঘুমাতে পারেন নি। সারা রাত শিশুর মতো কেঁদেছেন। পরদিন ফজরের নামাজের আগে তিনি তাঁর রক্তপোশাক পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বাকি জীবন তিনি আর এই ভয়ঙ্কর বস্ত্র পরিধান করেন নি।

বাহাদুর শাহ ?

তোতা বলল, আল্লাহ আকবর।

পাখির মতে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। সম্রাট সন্তোষ লাভ করলেন। তোতাকে স্বর্গীয় পক্ষী উপাধি দিলেন। তার জন্যে সোনার খাঁচা বানানোর নির্দেশ দিলেন।

সম্রাটকে পানি খাওয়ানোর দায়িত্বে নিযুক্ত জওহরকে এই পক্ষীর সেবক নিয়োগ করলেন। (এই জওহর সম্রাট হুমায়ূনের একটি জীবনী রচনা করেন। সম্রাটভগ্নি গুলবদনের পরেই জওহরের জীবনীকে প্রামাণ্য ধরা হয়।) সম্রাটের নির্দেশে এই তোতাপাখির একটি ছবি আঁকা হয়। ছবিটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এখনো সংরক্ষিত আছে।

জুন মাস। আগ্রার উপর দিয়ে কয়েকদিন ধরেই লু হাওয়া বইছে। পিঙ্গল আকাশে মেঘের দেখা নেই। লোকজন দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসা। কিছু মিঠাইয়ের দোকান খোলা। মিঠাইয়ের উপর ভনভন করছে মাছি। গরম কাল মাছিদের প্রিয় সময়। গরমে তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে।

আগ্রার পথেঘাটে ময়ূরের ঝাঁক। তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে। তারা কুৎসিত শব্দে ডাকে, চক্রাকারে ঘোরে, একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গরমে এদেরও মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। ময়ূর পেখম মেলার জন্যে অস্থির। বৃষ্টির দেখা নেই বলে পেখম মেলতে পারছে না।

আগ্রার অধিবাসীরা আজ খানিকটা উত্তেজিত। প্রধান কাজির নির্দেশে তিন অপরাধীর শাস্তি হবে। বিশেষ ধরনের শাস্তি বলেই উত্তেজনা। তিন অপরাধীর জন্যে তিনটি গাধা হত্যা করা হয়েছে। গাধাগুলির চামড়া ছিলানো হয়েছে। অপরাধীদের গাধার চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে চামড়া সেলাই করে দেওয়া হবে। তারপর তাদের শুইয়ে দেওয়া হবে ঘোড়ার গাড়িতে। এই গাড়ি আগ্রা শহরময় ঘুরবে। প্রচণ্ড গরমে গাধার চামড়া এঁটে বসে যাবে অপরাধীদের গায়ে। তাদের মৃত্যু হবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে।

তিন অপরাধী গাধার চামড়ায় মোড়া অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ির পাটাতনে শুয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ি চলছে। ঘোড়ার গাড়ির চালকের

হাতে রুপার ঘণ্টা। সে মাঝে মাঝে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। ঘণ্টাধ্বনি শাস্তির ঘোষণা। প্রচণ্ড গরমে গাধার চামড়া অপরাধীদের গায়ে এঁটে বসছে। তাদের একজন 'পানি পানি' বলে অস্ফুট শব্দ করছে। গাড়ির পেছনে এক দঙ্গল ছেলেপুলে। তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তারা মাঝে মাঝে ঢিল ছুঁড়ছে। যখনই কোনো ঢিল গাধার চামড়ায় আবৃত অপরাধীদের উপর পড়ছে, তখনই তারা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে।

গরম অসহনীয় বোধ হওয়ায় সম্রাট গোসলখানায় 'দরবারে খাস' বসিয়েছেন। তাঁর প্রিয় অমাত্যরা গোসলখানায় জড়ো হয়েছেন। সম্রাট হাম্মামে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছেন। দুজন খোজা বালক মাঝে মাঝে তাঁর মাথায় পানি ঢালছে। পানিতে গোলাপগন্ধ। অসংখ্য গোলাপ পাপড়ি ছড়িয়ে পানিতে এই গন্ধ আনা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থায় পানি শীতল করা হয়েছে। শীতলকরণ-পদ্ধতি চালু আছে। সম্রাট যতক্ষণ হাম্মামে থাকবেন ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলবে।

পানির শীতলকরণ-পদ্ধতি যথেষ্টই বৈজ্ঞানিক। বাষ্পীভবনের সময় পানি কিছু উত্তাপ নিয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। উত্তাপ নেওয়ার কারণে পানি ঠাণ্ডা হয়। প্রকাণ্ড সব মাটির জালার গায়ে পানি ঢেলে বাতাস দেওয়া হচ্ছে। এতে বাষ্পীভবন-প্রক্রিয়া দ্রুত হচ্ছে।

সম্রাটকে ঘিরে আছেন দরবারে খাসের অমাত্যজন। মন্ত্রীসভার সকল সদস্য আছেন। দুজন সেনাপতি আছেন। আজকের দরবারে খাসে আফগান শের খাঁর বিষয়ে আলোচনা হবে। শের খাঁ শক্তি সঞ্চয় করেই যাচ্ছে। তার বিষয়ে কখন কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা সম্রাট বলবেন। আলোচনায় অন্যরাও অংশ নিতে পারবে, তবে কে অংশ নেবে তা সম্রাট আঙুলের ইশারায় ঠিক করবেন। ইচ্ছামতো মতামত জাহির করার সুযোগ নেই। গোপন আলোচনা খোজাদের সামনেই হচ্ছে, তাতে

কোনো সমস্যা নেই। গোসলখানায় উপস্থিত সব খোজাই বধির। কানে গলন্ত সীসা ঢেলে তাদের কান নষ্ট করা হয়েছে।

সভা শুরুর আগে আগে সম্রাট একটি শের আবৃত্তি করলেন—

মুরদই লাখ বুড়া চাহে তো কেয়া হোতা হ্যায়
ওই হোতা হ্যায় যো মঞ্জুরে খোদা হোতা হ্যায়।
(শত্রুরা আমার যতই অনিষ্ট কামনা করুক তাতে
কিছুই হবে না। ঈশ্বর যা মঞ্জুর করবেন তা-ই হবে
আমার ভাগ্যলিপি।)

দরবারিরা একসঙ্গে বললেন, মার্‌হাবা! মার্‌হাবা!

সম্রাট হাসলেন। দ্বিতীয় শের আবৃত্তি করলেন—

হর মুসিবৎকো দিয়া এক তবসুমসে জবাব
ইসতরাহ্ গরদিসে দৌড়োকে রুলায়া হ্যায় ম্যায়নে।
(দুর্দিন ভেবেছিল সে আমাকে কাঁদাবে।
উল্টা হাসিমুখে আমি তাকে কাঁদিয়েছি।)

আবারও আওয়াজ উঠল, মার্‌হাবা! মার্‌হাবা!

প্রধান উজির বললেন, গোস্তাকি মাফ হয়। এই অপূর্ব শের কার কলম থেকে বের হয়েছে?

সম্রাট বললেন, এই শের তোমাদের বাদশাহর কলম থেকে এসেছে। সে হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ হলেও অন্তরে একজন অক্ষম দুর্বল কবি।

প্রধান উজির কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, সম্রাট ইশারায় তাঁকে থামিয়ে সভা শুরু করলেন। এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে অমাত্যদের মধ্যে গৌণ একজনকে হাম্মামে নামতে বললেন। সম্রাটের সঙ্গে স্নান করা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। যাকে হাম্মামে নামতে বলা হলো, তাঁর

চেহারা অতি সাধারণ। মধ্যম আকৃতির কৃশকায় একজন মানুষ। তাঁর নাম বৈরাম খাঁ। (মোঘল ইতিহাসের প্রধান পুরুষদের একজন।) গোসলখানায় যখন দরবারে খাস বসে তখন উপস্থিত সবাই পানিতে নামার প্রস্তুতি নিয়ে আসে। যেন সম্রাটের হুকুম পাওয়ামাত্র পানিতে নামতে পারে।

সম্রাট বললেন, এখন একটি পত্র পাঠ করা হবে। পত্রপাঠের পর পত্রের উপর আলোচনা। পত্র পাঠিয়েছেন আফগান পাঠান—শের খাঁ।

সম্রাটের নির্দেশে প্রধান উজির পত্র পাঠ করলেন।

পত্র

প্রেরক : দাসানুদাস সেবক শের শাহ।

প্রাপক : আল সুলতান আল আজম ওয়াল খাকাল আল মুকাররাম, জামিই সুলতানাত-ই-হাকিকি ওয়া মাজাজি, সৈয়দ আল সালাতিন, আবুল মোজাফফর নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ **হুমায়ূন পাদশাহ**, গাজি জিল্লুল্লাহ।

হে মহান সম্রাট, হিন্দুস্থানের রক্ষাকর্তা ও মালিক। আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহের ফুটন্ত গোলাপ। মহান কবি ও চিত্রকর হুমায়ূন।

হে বাদশাহ, আপনি কি অধম শের খাঁ'র উপর নারাজ হয়েছেন ? হিন্দুস্থান হলো গুজবের বাজার। সেই বাজারের বর্তমান দুর্গন্ধময় গুজব হলো—আপনি অধম শের খাঁ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হে সম্রাট! আমি কি এমন কিছু করেছি যার জন্যে আপনার বিরাগভাজন হয়েছি ? চুনারের দুর্গ আমার পুত্র কুতুব খাঁর দখলে, এটা সত্য। সম্রাটের আদেশ পাওয়ামাত্র কুতুব খাঁ দুর্গের চাবি আপনার পবিত্র হাতে তুলে দিয়ে আপনার পদচুম্বন করবে। তবে আপনার কোনো প্রতিনিধির হাতে না। আপনি স্বয়ং উপস্থিত হলে তবেই দুর্গের চাবি আপনার হস্ত মোবারকে দেওয়া হবে। আমি পুত্রকে নিয়ে বঙ্গদেশের ভেতরে চলে যাব। এর অন্যথা কখনো হবে না।

হে পবিত্র সম্রাট, আপনি গুপ্তচর মারফত খবর নিয়ে নিশ্চয়ই জেনেছেন আমি আমার নিজের নামে খুৎবা পাঠ করাই না। মহান মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের নামেই জুমার নামাজে খুৎবা পাঠ করা হয়। টাঁকশাল থেকে আমার নামে কোনো মুদ্রা তৈরি হচ্ছে না।

এই অধম যেখানে সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত তখন আপনি তার উপর বিরাগ হচ্ছেন, অথচ আমি যতদূর জানি আপনার ভাই আসকারি মীর্জা এবং কামরান মীর্জা তাঁদের নামে খুৎবা পাঠ করছেন। টাঁকশালে তাঁদের নামে স্বর্ণমুদ্রা তৈরি হচ্ছে। এরকম কিছু মুদ্রা আপনার কাছে পাঠালাম।

মহান সম্রাট, আপনার দুই ভাইয়ের নাম এখানে এনে যদি অপরাধ করে থাকি তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার মহান পিতা বঙ্গদেশের ফল আম অত্যন্ত পছন্দ করতেন। আমি আম এবং

আরও কিছু বঙ্গদেশীয় ফল আপনার সেবার জন্যে পাঠালাম। এই সঙ্গে একটি বিষ্ণুমূর্তি। বিষ্ণুমূর্তিটির ওজন এগারো সের। সম্পূর্ণ স্বর্ণনির্মিত, এর চোখ নীলকান্তমণির। এই বিষ্ণুমূর্তি বিষয়ে প্রচলিত গল্প হলো, ভয়াবহ বিপদের আগে আগে সে অশ্রুবর্ষণ করে। রহস্যময় বিষয়ে আপনার আগ্রহের কথা জানি বলেই বিষ্ণুমূর্তি বিষয়ে প্রচলিত গল্পটি জানালাম।

ইতি

শের খাঁ

আপনার দাসানুদাস সেবক।

রোশন কাকু (আমীর) বললেন, আমি শের খাঁ'র পত্রে সন্তোষ বোধ করছি।

বৈরাম খাঁ বললেন, দুষ্টলোকের ছলনায় ভোলার কোনো কারণ দেখি না।

কাকু বললেন, শের খাঁ তার নামে খুৎবা পাঠ করে না, এটা তো সত্য। তার নামে মুদ্রা বের হয় নি, এটাও সত্য।

বৈরাম খাঁ বললেন, খুৎবা পাঠ করলেই সম্রাটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। শের খাঁ বুদ্ধিমান বলেই খুৎবা পাঠ করছে না। শক্তি সঞ্চয় করছে। চুনার দুর্গ যদি শের খাঁ'র দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে সম্রাটের যে-কোনো প্রতিনিধির কাছে দুর্গ দেবে। স্বয়ং সম্রাটকে কেন উপস্থিত হতে হবে?

উজির তর্দি বেগ খান বললেন, আপনি কি মনে করেন সম্রাটের যুদ্ধযাত্রা করা উচিত?

বৈরাম খাঁ বললেন, অবশ্যই উচিত। এবং এখনই যুদ্ধযাত্রা করা প্রয়োজন।

তর্দি বেগ বললেন, এখনই কেন ?

বৈরাম খাঁ বললেন, সম্রাটের অনুমতি পেলে আমি ব্যাখ্যা করব কেন কালবিলম্ব না করে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত।

সম্রাট বললেন, অনুমতি দেওয়া হলো।

বৈরাম খাঁ বললেন, শের খাঁ হলো ধূর্ত শেয়াল। সুন্দর একটি চিঠি পাঠিয়ে সে সম্রাটকে শান্ত করেছে। সে কল্পনাও করছে না সম্রাট এরকম একটি চিঠি পাওয়ার পরও যুদ্ধযাত্রা করবেন। কাজেই সে নিশ্চিন্ত আছে। রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো প্রস্তুতি তার নেই। এই সুযোগে মোঘল সৈন্য অতর্কিতে শের খাঁ'র ঘাড়ের উপর পড়লে চিরদিনের মতো আফগান শক্তির পতন হবে।

সম্রাট বললেন, আলোচনা বন্ধ। সবাইকে আমি হামামখানায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উপস্থিত অমাত্যদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। সবাই পানিতে নামল।

সম্রাট শের খাঁ'র পাঠানো ফল এবং বিষ্ণুমূর্তি গোসলখানায় আনার নির্দেশ দিলেন। বিষ্ণুমূর্তি দেখে সম্রাট বিস্মিত হলেন। এত সুন্দর কাজ! সম্রাট বললেন, যে কারিগর এই মূর্তি তৈরি করেছে তার উদ্দেশে মার্‌হাবা।

সবাই বললেন, মার্‌হাবা!

প্রধান উজির বললেন, রাজকোষে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি থাকা বাঞ্ছনীয় না। মূর্তি গলিয়ে সোনা করে রাজকোষে জমা হোক।

হুমায়ূন বললেন, না। এই মূর্তি যেমন আছে তেমন থাকবে। আমি আজ তার সঙ্গে স্নান করব।

বিষ্ণুমূর্তি হাম্মামে নামিয়ে দেওয়া হলো। বঙ্গদেশের ফলগুলির মধ্যে একটি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অত্যন্ত রসালো ফল। মুখে দিলেই জিভের রঙ বদলে কালো হয়ে যাচ্ছে। এই ফলের কী নাম কেউ বলতে পারল না। [ফলটি কালো জাম, কিংবা তুঁত।]

হুমায়ূন গোসলখানায় ঘোষণা দিলেন শের খাঁ'র বিষয়ে তাঁর কোনো উদ্বেগ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার কিছু নেই। বাহাদুর শাহ্ পরাজিত হয়েছে। পর্তুগীজদের হাতে সে নিহত। সে অপুত্রক বিধায় তাকে এবং তার বংশধর নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। সেই উপলক্ষে তেমন কোনো আনন্দ-অনুষ্ঠান হয় নি। দুই মাসব্যাপী আনন্দ উৎসব হবে। এই দুই মাসে প্রতিদিন দশজন করে সাধারণ প্রজা আমার সঙ্গে রাজকীয় খানায় অংশগ্রহণ করবে।

মাগরেবের নামাজের পর হুমায়ূনকে জানানো হলো, গাধার চামড়া পরিয়ে যে তিন অপরাধীকে সারা দিন ঘুরানো হয়েছে তাদের দু'জন মারা গেছে। একজন এখনো জীবিত। হুমায়ূনের নির্দেশে চামড়া থেকে মুক্ত করে তাকে সম্রাটের সামনে আনা হলো। তার দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। তার সমস্ত শরীর ফুলে গেছে। চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। সম্রাট বললেন, তোমার নাম কী ?

সে অতি কষ্টে বলল, সম্রাট, আমি একজন মৃত মানুষ। মৃত মানুষের নাম থাকে না।

তুমি কী অপরাধ করেছিলে ?

আপনার এক আমীর আমার অতি আদরের কন্যাকে তার হেরেমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি সেই নির্দেশ পালন করি নাই। এটাই আমার অপরাধ। আমাকে মিথ্যা হত্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল। মহান কাজি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

আমার সেই আমীরের নাম কী ?

সে নাম বলতে পারল না। ততক্ষণে তার হেঁচকি উঠেছে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে ঠোঁট নাড়ছে কিন্তু মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হলো। *

সম্রাট হুমায়ূন এর পরপর একটি রাজকীয় ফরমান জারি করলেন।

যে-কোনো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে সম্রাটের অনুমতি নিতে হবে।

এ ছাড়াও তিনি যুদ্ধে ব্যবহার হয় এমন একটি দামামার ব্যবস্থা করলেন। কোনো প্রজা যদি মনে করে তার উপর বিরাট অবিচার করা হচ্ছে, তাহলে সে দামামায় বাড়ি দিয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

এই কাজটা করতে হবে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় সম্রাটের শোবার ঘরের জানালা খুলে যায়। তিনি জানালায় মুখ বের করে প্রজাদের দর্শন দেন। এই দর্শনের নাম 'ঝড়োয়া কি দর্শন'। প্রজারা সম্রাটকে দেখে আশ্বস্ত হয় যে, সম্রাট বেঁচে আছেন। রাজত্ব ঠিকমতো চলছে।

বাঁশিতে ভৈরবীর সুর বাজছে। সূর্য উঠছে। সম্রাট হুমায়ূন 'ঝড়োয়া কি দর্শন' দেবেন। প্রজার দল উপস্থিত।

জানালা খুলে গেল। সম্রাটের প্রিয় নফর জওহর আবতাবচি রেশমি পর্দা সরাল। সম্রাটের হাসিহাসি মুখ দেখা গেল। সম্রাটের হাতে একটি ফুটন্ত গোলাপ। তিনি গোলাপের ঘ্রাণ নিয়ে জানালার নিচে সমবেত প্রজাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সম্রাটের ফুল হাতে পাওয়ার জন্য প্রজারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর ঠিক তখনই দামামার শব্দ হলো। সম্রাট ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকালেন।

---

* আমীরের নাম তর্দি বেগ খান। সম্রাট আকবরের সময় বৈরাম খাঁ তাঁকে হত্যা করেন।

বিচার পেতে ব্যর্থ প্রজারাই শুধু এই দামামায় ঘা দিতে পারে। কে ঘা দিল ?

দামামার পাশে সারা শরীর কালো বোরকায় ঢাকা এক জেনানা দেখা যাচ্ছে। সে দামামায় বাড়ি দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্রাট নির্দেশ দিলেন আজ সন্ধ্যায় 'দরবারে-আম' বসবে। সেখানে এই জেনানার বক্তব্য প্রথম শোনা হবে। দরবারে আমে প্রবেশের জন্য এই মহিলাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে বলা হলো।

'ঝড়োয়া কি দর্শন' শেষ হয়েছে। সম্রাট নিজের ঘরে ফিরে গেছেন। তিনি কিছুক্ষণ কোরান পাঠ করবেন। কোরান পাঠের পর একটি বই পড়বেন। মূল বই হিন্দুস্তানি ভাষায় লেখা (মনে হয় সংস্কৃত কিংবা আদি বাংলা,—লেখক)। সম্রাটের নির্দেশে বইটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বইয়ের শিরোনাম—

অদৃশ্য হইবার মন্ত্র

বইতে হিন্দু যোগীরা কীভাবে অদৃশ্য হন তার বিষদ বর্ণনা এবং মন্ত্র দেওয়া আছে। যেসব উপকরণের উল্লেখ আছে তা হলো, শ্মশানে ভাঙা কলসির মাথা (কালো রঙ), বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির পাঁজরের হাড়, যে দড়িতে ফাঁসি হয়েছে সেই দড়ি। প্রথম রজস্বলা কিশোরীর দূষিত রক্ত। ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ। বেশ্যা রমণীর যৌনকেশ... ইত্যাদি।

দরবারে আমে বিচারপ্রার্থী তরুণী উপস্থিত। সম্রাটের নির্দেশে সে মুখের নেকাব খুলেছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির রূপ দেখে সম্রাট হতভম্ব। কী সুন্দর বড় বড় চোখ। চোখের দীর্ঘ পল্লব। সম্রাট বললেন, নাম ?

তরুণী আভূমি নত হয়ে বলল, বাঁদির নাম আসহারি।

পরিচয় ?

সম্রাটকে দেওয়ার মতো কোনো পরিচয় এই বাঁদির নেই। আমি আপনার হেরেমে বাস করি। আপনার মহান পিতা বাদশাহ বাবরকে একবার গান গেয়ে শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

তোমার অভিযোগ কী ?

মহান সম্রাট বাদশাহ বাবর আমার গান শুনে খুশি হয়ে আমায় সমওজনের স্বর্ণমুদ্রা দিতে হুকুম করেছিলেন। আমি তা পাই নাই। অবশ্য খাজাঞ্জিখানা থেকে আমাকে সমওজনের তাম্রমুদ্রা দেওয়া হয়। সেটাও কাগজ-কলমে।

তোমার অভিযোগের পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে ?

আমার হৃদয় একমাত্র সাক্ষী। আর কোনো সাক্ষী নাই।

সম্রাট দাওয়াতদারকে (লিখনসামগ্রীর ব্যবস্থাপক। প্রতিদিনের হিসাবরক্ষক।) বললেন, ঐদিনের ঘটনা কী তা যেন রেকর্ড ঘেঁটে জানানো হয়। প্রতিদিনের ঘোষণার কপি কিতাবদারের (গ্রন্থাগারিক) কাছেও থাকে। তাকেও রেকর্ডপত্র বের করতে বলা হলো।

আসহারি বলল, সম্রাট আমার আর্জি শুনেছেন, এতেই আমার জীবন ধন্য। পুরাতন রেকর্ড খোঁজার প্রয়োজন নেই।

সম্রাট বললেন, কী প্রয়োজন আর কী প্রয়োজন না, তা তোমার কাছ থেকে জানতে আমি আগ্রহী না। আমি আগ্রহী সেই গানটি শুনতে যা আমার মহান পিতা শুনেছিলেন। তুমি কি গান শোনাতে প্রস্তুত হয়ে এসেছ ?

জি জাহাঁপনা।

সঙ্গীতের আসর বসল। বাদ্যকররা আসহারির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আসহারির গলার সমন্বয় করল।

আসহারি গান করল। গান শেষ হওয়ামাত্র সম্রাট হুমায়ূন ঘোষণা করলেন, পুরাতন নথিপত্র পরে ঘাঁটা হবে। এই মুহূর্তে গায়িকার

ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তাকে দেওয়া হোক। আমি এই গায়িকাকে 'আগ্রার বুলবুল' সম্মানে সম্মানিত করলাম। আজ থেকে তার নামের আগে 'আগ্রার বুলবুল' ব্যবহৃত হবে।

সভার নিয়ম অনুযায়ী সবাই একসঙ্গে বলল, মার্‌হাবা! মার্‌হাবা!

সম্রাট বললেন, আগ্রার বুলবুল আসহারি, তোমার কি আর কিছু বলার আছে?

আসহারি বলল, আছে। সম্রাটের অভয় পেলেই বলতে পারি।

বলো।

আমি হেরেমবাসী। এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে রাখা হেরেমে সম্ভব না। আমি আমার এই সম্পদ রাজকোষে জমা দিতে চাই। সম্রাট অনেক জনহিতকর কাজে রাজকোষের সম্পদ ব্যবহার করেন। আমার সামান্য অর্থ সেই কাজে ব্যবহৃত হলেই আমি খুশি হব।

সম্রাট বললেন, তা-ই করা হবে। আমি আগ্রার বুলবুলের কথায় সন্তোষ লাভ করেছি।

দরবারে আম শেষ হওয়ার পর সম্রাট একটা ফরমান জারি করলেন। সেই ফরমানে বলা হলো—এখন থেকে সম্রাট যেখানে যাবেন, প্রমোদভ্রমণ হোক বা যুদ্ধযাত্রা, আগ্রার বুলবুল তাঁর সঙ্গে থাকবে। সে তার বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে আলাদা রাজকীয় তাঁবুতে থাকবে। তার সেবায় দশজন খোজা প্রহরী থাকবে। 'মিরনসুর' পরগনা খেলাত হিসেবে আগ্রার বুলবুলকে দেওয়া হলো। এই পরগনার আয় আগ্রার বুলবুল আসহারি পাবে।

দুই মাসব্যাপী উৎসব শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড দাবদাহ হঠাৎ শীতল হয়ে গেল। আগ্রার উপর ভারী বর্ষণ, এই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। দুই সের ওজনের একটি শিলা এক প্রজা নিয়ে এল বাদশাকে দেখাতে। সম্রাট খুশি হয়ে

তাকে একটা আশরাফি দিলেন। এতবড় শিলা তিনি আগে কখনো দেখেন নি। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন, আল্লাহ্‌পাকের রহমত এবং নিদর্শন চারদিকে ছড়ানো। আমরা অন্ধ বলেই তা দেখি না। প্রকাণ্ড এক শিলার মাধ্যমে পরম করুণাময় তাঁর নিদর্শন তাঁর দীন সেবককে দেখালেন। সোবাহানাল্লাহ্‌।

শিলাখণ্ড গলিয়ে তার পানি সম্রাট পান করলেন। পানিতে বারুদের গন্ধ তাঁকে বিস্মিত করল। এটা কি কোনো যুদ্ধের আলামত ? তাঁকে কি যুদ্ধযাত্রা করতে বলা হচ্ছে ?

শাহি ফরমান জারি হয়েছে। সম্রাট হুমায়ূন শের খাঁ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। শের খাঁকে বন্দি অবস্থায় দিল্লী আনা হবে। সেই উপলক্ষে মাসব্যাপী উৎসব। উৎসবের নাম ঠিক হয়েছে 'শের খাতেমুন', যার অর্থ—শেরের শেষ।

শের খাঁকে বন্দি করতে কতদিন লাগবে এটা বোঝা যাচ্ছে না। সে সরাসরি সম্মুখ সমরে আসে না। চোরাগোপ্তা হামলা করে। তার যুদ্ধ কাপুরুষের যুদ্ধ। মোঘল বাহিনী কাপুরুষ যুদ্ধে অভ্যস্ত না বলেই সমস্যা।

সম্রাট বাংলা মুলুক কখনো দেখেন নি। শের খাঁকে পরাস্ত করে তিনি বাংলা মুলুকে কিছুদিন বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলা মুলুকের বর্ষার অনেক গল্প শুনেছেন। সেই বর্ষা দেখবেন। বর্ষায় সেখানকার সব নদী নাকি সমুদ্রের মতো হয়ে যায়। এক কূল থেকে আরেক কূল দেখা যায় না। তাঁর নদী দেখার শখ আছে। বাংলা মুলুকের হিজড়ারা নাকি নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শী। তাদের নৃত্যগীত সাধারণ নৃত্যগীতের চেয়ে আলাদা। কতটা আলাদা সেটাও সম্রাটের দেখার ইচ্ছা।*

মোঘল সম্রাটদের যুদ্ধযাত্রা বিশাল ব্যাপার। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যুদ্ধযাত্রার খরচ হিসেবে আমীররা সঞ্চিত ধনরত্ন জমা দিতে শুরু করলেন। শুধু ধনরত্ন না, তাদেরকে ঘোড়াও দিতে হলো। যে এক হাজারি আমীর সে দেবে এক হাজার ঘোড়া। পাঁচ হাজারি

---

*সম্রাটের ভাই আসকারি মীর্জা বঙ্গ বিজয়ের পর সম্রাটের কাছে উপহার হিসেবে কয়েকজন হিজড়া চেয়েছিলেন।

আমীর দেবে পাঁচ হাজার ঘোড়া। করদ রাজ্যের রাজাদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য এবং স্বর্ণমুদ্রা পাঠাতে হলো।

যুদ্ধযাত্রার জন্যে একটা বরগা তাঁবু রওনা হয়ে গেছে। বরগা তাঁবুতে একসঙ্গে দশ হাজার মানুষ দাঁড়াতে পারে। এই তাঁবু খাটাতে এক হাজার তাঁবুর কারিগরকে সাত দিন খাটতে হয়।

সম্রাটের জন্যে যাচ্ছে ডুরসানা-মঞ্জেল তাঁবু। এটি দোতলা। উপরের তলায় সম্রাট নামাজ পড়বেন। নিচতলায় বেগমরা থাকবেন।

সম্রাট রাতে ঘুমাবেন চৌবিলরৌতি তাঁবুতে। এই তাঁবুর চালের নিচে খসখসের সিলিং দেওয়া। নিচেও থাকে খসখস। খসখসের উপর কিংখাব ও মলমল। তাঁবু খাটাবার দড়ি রেশমের।

সম্রাট হুমায়ূন আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধপ্রস্তুতি লক্ষ করতে লাগলেন। তাঁর আনন্দ কিছু বাধাগ্রস্ত হলো বৈরাম খাঁ'র কারণে। বৈরাম খাঁ বললেন, দিল্লী ত্যাগ করা মোটেই ঠিক হবে না।

সম্রাট বললেন, সমস্যা কী?

বৈরাম খাঁ বললেন, সমস্যা আপনার তিন ভাই। আপনার অনুপস্থিতিতে তারা দিল্লীর সিংহাসন দখলের চেষ্টা চালাবে।

হুমায়ূন বললেন, আমি আমার ভাইদের নিজের প্রাণের মতোই ভালোবাসি। তারা তিনজনই আমার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবে।

তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবে না।

তুমি আমার সঙ্গে বাজি রাখতে চাও?

সম্রাটের সঙ্গে বাজি রাখার স্পর্ধা এই নফরের নেই।

আমার এই তিন ভাইয়ের কারণেই কি তুমি যুদ্ধযাত্রা করতে চাচ্ছ না, নাকি আরও কারণ আছে?

বাংলা মুলুকে বর্ষা এসে যাবে। মোঘল সেনাবাহিনী বর্ষার সঙ্গে পরিচিত না।

এখন পরিচয় হবে। আমিও পরিচিত হব। কলমচিকে খবর দাও, আমি তিনভাইকে পত্র লিখব। এখনই লিখব।

সম্রাট পত্র লিখলেন। তিনজনকে আলাদা আলাদা চিঠি। মীর্জা কামরানকে লেখা চিঠির নমুনা—

আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা কামরান মীর্জা।
আমার হৃদয়ের পাখি। বাগিচার সৌরভময় গোলাপ।

প্রিয় ভ্রাতা,
বাংলা মুলুকের শের খাঁ নামের দুষ্টকে শায়েস্তা করতে বিশাল মোঘল বাহিনী অতি শীঘ্র যাত্রা শুরু করবে। তুমি তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে লাহোর থেকে চলে এসো। বড়ভাইয়ের দক্ষিণ বাহু হও। আমার তিন ভাই পাশে থাকলে আমি বিশ্ব জয় করতে পারি। যেমন করেছিলেন জুলকারলাইন।*

আমার বহরের সঙ্গে তোমার অতি আদরের ভগ্নি গুলবদন থাকবে। সে তোমার সাক্ষাতের জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছে। প্রিয় ভ্রাতা, তোমার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে আমি একটি নীলা এবং একটি পোখরাজ পাঠালাম। তুমি রত্ন দু'টিকে প্রতিদিন দুগ্ধস্নান করাবে। এর অন্যথা হলে রত্নের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হবে। এখন তাৎক্ষণিকভাবে তোমার উদ্দেশে রচিত পঞ্চপদী—

কামরান
চন্দ্র প্রস্ফুটিত তার দু'নয়ন।

---

*আলেকজান্ডার দি গ্রেট

হৃদয় আর্দ্র আবেগে
যার কেন্দ্রে তার ভাই
মীর্জা হুমায়ূন।

কামরান মীর্জা পত্রের জবাব দিলেন না। তাঁর দরবারের এক আমীরকে সম্রাটের কাছে পাঠালেন। আমীর সম্রাট হুমায়ূনকে জানালেন, পাঁচটি কারণে কামরান মীর্জা তাঁর সঙ্গে যেতে পারছেন না।

১. তিনি অসুস্থ। পেটের পীড়ায় ভুগছেন।
২. তাঁর প্রধান গণক গণনা করে পেয়েছে, যুদ্ধযাত্রায় তাঁর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।
৩. লাহোর অরক্ষিত রেখে রওনা হওয়ার অর্থ শত্রুর হাতে লাহোর তুলে দেওয়া।
৪. স্বপ্নে তিনি তাঁর পিতা সম্রাট বাবরকে দেখেছেন। সম্রাট বাবর তাঁকে লাহোর ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছেন।
৫. তাঁর প্রিয় ঘোড়া লালী মারা গিয়েছে। তিনি ভালো ঘোড়ার সন্ধানে আছেন। শিক্ষিত এবং পরিচিত ঘোড়া ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যায় না।

সম্রাট হুমায়ূন আমীরকে বললেন, আমার ভাই কামরান মীর্জা আমার সঙ্গে না যাওয়ার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছে। একটি কারণই যথেষ্ট ছিল। পাঁচটি কারণের একটিতে সে আমার মহান পিতাকে টেনে এনেছে। তার প্রয়োজন ছিল না। আপনি আমার ভাইকে বলবেন, যা ঘটবে আল্লাহ্‌পাকের হুকুমেই ঘটবে। আমি কামরান মীর্জার জন্যে একটি শিক্ষিত আরবি ঘোড়া আপনার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। পেটের পীড়া একটি নোংরা ব্যাধি। আমি দ্রুত তার আরোগ্য কামনা করছি।

সম্রাটের নির্দেশে আমীরকে একপ্রস্থ পোশাক, একটি রত্নখচিত তরবারি, দশটা আশরাফি দেওয়া হলো। ভাইয়ের পাঠানো দূতের প্রতি সম্মান দেখানো হলো। এই আমীরের নাম মীর হামজা।

মীর হামজা লাহোর ফিরছেন। তাঁর সঙ্গে বিশজন অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র দল। রসদ বহনকারী একটা ঘোড়ার গাড়ি। এই গাড়ির সঙ্গেই কামরান মীর্জাকে দেওয়া সম্রাট হুমায়ূনের আরবি ঘোড়া বাঁধা। ঘোড়ার রঙ সাদা। তার নাম ফাতিন। ফাতিন শব্দের অর্থ সুন্দর।

বিশ ক্রোশ অতিক্রম করার পর মীর হামজাকে থামতে হলো। অশ্বারোহী বিশাল বাহিনী নিয়ে বৈরাম খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন। বৈরাম খাঁ বললেন, সম্মানিত আমীর মীর হামজা! আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

মীর হামজা বললেন, অশ্বারোহী বিশাল বাহিনী নিয়ে একান্তে কথা ?

আমরা দুজন দূরে সরে যাব। একান্ত কথা সেখানেই হবে।

আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে এসেছেন কেন ?

বৈরাম খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, গাধার বেপারি সঙ্গে গাধা নিয়ে চলাফেরা করে। গাধাগুলি হচ্ছে তার শোভা। একজন সেনাপতির শোভা তার সৈন্যবাহিনী।

আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলব না। যা বলতে চান এখানে বলুন।

আমার সম্রাটের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে। সম্রাটকে আপনার কেমন মনে হয়েছে ?

তিনি ভীতুপ্রকৃতির মানুষ।

ভীতু ?

হ্যাঁ ভীতু। ভীতু বলেই ভাইকে খুশি রাখার চেষ্টা করছেন।

ভ্রাতৃস্নেহও তো হতে পারে।

সম্রাটদের ভ্রাতৃস্নেহ থাকে না। ভ্রাতৃভীতি থাকে।

সম্রাট হুমায়ূন যুদ্ধযাত্রার পরপর কি কামরান মীর্জা নিজেকে দিল্লীর সম্রাট ঘোষণা করবেন ?

সেটা উনিই ভালো বলতে পারবেন। আমি অন্তর্যামী না।

আমি এই তথ্য বিশেষভাবে জানতে চাচ্ছি। সম্রাটের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি অস্থির।

মীর হামজা বললেন, আপনাকে আগেই বলেছি আমি অন্তর্যামী না। কামরান মীর্জার পরিকল্পনা আমি জানি না।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি কামরান মীর্জার পরিকল্পনা আঁচ করতে পারছি। আপনি এই খবর কামরান মীর্জাকে জানাবেন।

অবশ্যই জানানো হবে।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনাকে মুখে কিছু জানাতে হবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করব যে আপনি লাহোরে উপস্থিত হওয়ামাত্র কামরান মীর্জা যা বোঝার বুঝে নেবেন।

কী ব্যবস্থা করবেন ?

আপনার জন্যে একটি গাধা সংগ্রহ করা হয়েছে। আপনি গাধার পিঠে চড়ে লাহোরে যাবেন। নগ্ন অবস্থায় যাবেন।

আপনি উন্মাদের মতো কথা বলছেন।

হতে পারে। আপনার সঙ্গের অশ্বারোহীরা আমার সেনাবাহিনীতে যোগ দিবে। এরা ভাড়াটিয়া সৈন্য। দলত্যাগে তাদের কখনো সমস্যা হয় না।

সম্রাট হুমায়ূনের কানে এই খবর পৌছানোর পরিণাম হবে ভয়াবহ।

তাঁর কানে এই খবর আমিই পৌছাব। তাঁকে বলব, মীর হামজা লাহোরের পথে রওনা হওয়ার পর একদল ডাকাতের হাতে পড়েন। ডাকাতরা তাঁর সব লুটে নিয়ে তাঁকে নগ্ন করে গাধার পিঠে তুলে দেয়। সম্রাট এই খবরে আমোদ পাবেন, তিনি আমোদ পছন্দ করেন।

মীর হামজাকে সত্যি সত্যি নগ্ন করে গাধার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হলো।

ফজরের নামাজের পরপরই সম্রাট হুমায়ূনের বিশাল বাহিনী বঙ্গদেশের দিকে যাত্রা শুরু করল। তারিখ : ২৭ জুলাই ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।

সম্রাট আনন্দিত, কারণ তার দুই ভাই হিন্দাল মীর্জা এবং আসকারি মীর্জা তাঁর সঙ্গে আছেন।

যাত্রার সময় আশ্চর্য এক ঘটনাও ঘটেছে। দু'টি কবুতর সম্রাটের মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরেছে। এটি অতি শুভ লক্ষণের একটি।

অগ্রগামী দলে আছে অশ্বারোহী বাহিনী। তার পেছনেই পদাতিক বাহিনী। পদাতিক বাহিনী চলছে হস্তীযূথের সঙ্গে। হাতির সংখ্যা আট শ'।

সেনাদল কোথাও না থেমে আসর পর্যন্ত একনাগাড়ে চলবে। আসরের সময় বিশ্রাম এবং আহারের জন্যে থামা হবে। পরদিন আবারও ফজরের নামাজের পর যাত্রা শুরু হবে। যুদ্ধযাত্রার সময় সম্রাট একবেলা আহার করেন।

প্রথম যাত্রাবিরতিতে সম্রাটকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

পোলাও : পাঁচ ধরনের।

রুটি : সাত প্রকারের।

পাখির মাংস : কিসমিসের রসে ভেজানো পাখি ঘিতে ভেজে দেওয়া।

পাখিদের মধ্যে আছে হরিয়াল, বনমোরগ, বিশেষ শ্রেণীর ময়ূর।

ভেড়ার মাংস : আস্ত ভেড়ার রোস্ট।

বাছুরের মাংস : কাবাব।

পাহাড়ি ছাগের মাংস : আস্ত রোস্ট (সম্রাটের বিশেষ পছন্দের খাবার)।

ফল, শরবত, মিষ্টান্ন।

সম্রাট হুমায়ূন এবং তাঁর পরিবারের জন্যে যুদ্ধকালীন বাবুর্চির সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রধান বাবুর্চি নকি খান নতুন নতুন খাবার উদ্ভাবন করতেন। তাঁর উদ্ভাবিত একটি খাবার পুরনো ঢাকার কিছু রেস্তোরাঁয় এখনো পাওয়া যায়। খাবারের নাম গ্লাসি।

গ্লাসির রেসিপি (মোঘল আমলের) দেওয়া হলো। পাতলা স্লাইস করে কাটা খাসির মাংস সজারুর কাঁটা (বিকল্প, খেজুরের কাঁটা) দিয়ে কেঁচতে হবে। কেঁচানো মাংসে দিতে হবে কিসমিচের রস, পোস্তদানা বাটা, পেস্তা বাটা, শাহী জিরা বাটা, আদার রস, পেঁয়াজের রস, রসুনের রস, দই, দুধ এবং গম বাটা। পরিমাণমতো লবণ। এতে যুক্ত হবে জয়ত্রি গুঁড়া, জায়ফল গুঁড়া, দারুচিনি গুঁড়া। সব ভালোমতো মেখে মাটির হাঁড়িতে রেখে ঢাকনা লাগিয়ে দিতে হবে। মাটির হাঁড়ি সারা দিন রোদে থাকবে। খাবার পরিবেশনের আগে আগে অল্প আঁচে মাংসের টুকরা মহিষের দুধের ঘিতে (ভৈসা ঘি) ভাজতে হবে।

বঙ্গদেশের দিকে যাত্রার সময় তাঁর রসদখানায় মহিষের দুধের ঘি ছিল দশ মণ এবং গরুর দুধের ঘি ছিল ত্রিশ মণ।

সৈন্যদের খাবার ছিল : এক ঘটি দুধ, যবের রুটি, এক পোয়া ছাতু, মাংস এবং পেঁয়াজ।

যাত্রাবিরতির প্রথম রাত্রি।

হুমায়ূন এশার নামাজ শেষ করে তাঁর জন্যে খাটানো চৌবনরৌতি তাঁবুতে গেছেন। গানবাজনা শুনে আফিং খেয়ে ঘুমাবেন।

তাঁর নিজস্ব ভৃত্য জওহর আবতাবচি তাঁকে জানাল শের খাঁ তাঁর জন্যে কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। উপহারের মধ্যে আছে তিনজন অতি রূপবতী বাঙ্গালমুলুকের তরুণী এবং সাতজন হিজড়া। উপহারের সঙ্গে একটি পত্রও আছে।

সম্রাট পত্র পাঠ করলেন। শের খাঁ লিখেছেন—

দিল্লীশ্বর সম্রাট হুমায়ূন,

আপনি অধম তুচ্ছাতিতুচ্ছ শের খাঁকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছেন। আমি আপনার দাসানুদাস। আমার কারণে এই তীব্র গরমে আপনার কষ্ট হচ্ছে, এটা আমি নিতেই পারছি না।

আপনি দিল্লীতে ফিরে যান।

আপনাকে চুনার দুর্গ আমি দিয়ে দিচ্ছি।

কিছু উপহার পাঠালাম। আমি জানি উপহার আপনার পছন্দ হবে।

ইতি

অধম শের খাঁ (ফরিদ)

চিঠিতে কাজ হলো। সম্রাট নির্দেশ দিলেন, একদিন বিশ্রামের পর মূল সেনাবাহিনী দিল্লী ফেরত যাবে। ডেকে পাঠানো হবে শের খাঁকে। চুনার দুর্গের দখল নেওয়ার জন্যে রুমী খাঁকে পাঠানো হবে। রুমী খাঁর নেতৃত্বে থাকবে বেশ কিছু কামান এবং দুই শ' কামানচি। কামানের প্রয়োজন হবে না। তারপরেও থাকল।

ফজরের নামাজের পর দিল্লী যাত্রা শুরু হবে। নামাজের পরপর হুমায়ূন ঘোষণা করলেন চুনার দুর্গ হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তিনি উপস্থিত থাকতে চান। কাজেই যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত থাকবে। সম্রাটের খামখেয়ালির সঙ্গে তাঁর সেনাপতি এবং আমীররা পরিচিত। কেউ অবাক হলেন না।

চুনার দুর্গের অধিনায়ক শের খাঁ'র পুত্র কুতুব খাঁ।

চুনার দুর্গে পৌঁছতে হুমায়ূনের চার মাস সময় লাগল। তিনি নভেম্বরে পৌঁছলেন। আরামদায়ক আবহাওয়ায় হুমায়ূন প্রসন্ন।

ভেষজবিদ্যার উপর কিছু দুর্লভ বই তাঁর কাছে এসেছে। বইয়ে বর্ণিত গাছের গুণাগুণ পরীক্ষার বাসনায় তিনি অস্থির। দুর্গ দখলের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্ব শুরু করবেন।

দুর্গের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য কুতুব খাঁর কাছে দূত গেল। কুতুব খাঁ বললেন, সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত হলেই দুর্গ তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সম্রাটের দূত বললেন, সামান্য দুর্গ দখলের জন্যে হিন্দুস্থানের অধিপতির আসা শোভা পায় না।

কুতুব খাঁ বললেন, হিন্দুস্থানের অধিপতিকে অনেক তুচ্ছ কাজ কিন্তু করতে হয়। শব্দ করে তিনি বায়ু ত্যাগ করেন। আপনি হয়তো শোনেন নি।

আপনার ঔদ্ধত্যমূলক আচরণের সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

শুনে খুশি হলাম। আফগানরা সমুচিত জবাব ভালোবাসে।

আপনি যে নোংরা কথাগুলি বলেছেন আমি নিজে সম্রাটকে তা জানাব।

সেই সুযোগ আপনি পাবেন না।

এই কথার অর্থ কী ?

আপনাকে বাধ্য করা হবে সম্রাটকে একটা পত্র পাঠাতে। সেই পত্রে আপনি বিনয়ের সঙ্গে লিখবেন যে, আপনি স্বেচ্ছায় দলত্যাগ করে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জীবন থাকতে এ ধরনের চিঠি আমি লিখব না।

জীবন থাকা অবস্থাতেই আপনি লিখবেন। আমার নির্দেশে আপনাকে খোজা করানো হবে। খোজা করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ামাত্রই আপনি চিঠি লিখতে রাজি হবেন।

সম্রাট হুমায়ূন তাঁর দূতের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। চিঠিতে জানলেন এই আমীর দলত্যাগ করেছে। তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য সে ব্যয় করবে আফগানদের জন্যে।

হতভম্ব সম্রাট রুমী খাঁ-কে দুর্গ দখলের নির্দেশ দিলেন। রুমী খাঁ কামান দাগতে শুরু করলেন। এর উত্তরে কুতুব খাঁ'র দুর্গের ভেতর থেকে কামানের গোলা বৃষ্টির মতো পড়তে শুরু করল। কুতুব খাঁ'র কামানগুলি ছোট তবে তাদের নিশানা অব্যর্থ। রুমী খাঁ-কে পেছনে হটতে হলো।

মোঘল সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করে পাঁচ মাস বসে রইল। দুর্গ দখল করতে পারল না। এর মধ্যে শুরু হলো বঙ্গের বিখ্যাত বৃষ্টি।

সম্রাট হুমায়ূন দোতলা তাঁবুর (ডুরসানা মঞ্জেল) বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি পশ্চিমের দিগন্তরেখায়। ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে। সূর্য এখনো পুরোপুরি ওঠে নি। পশ্চিম আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সম্রাট প্রথম সূর্যকিরণ কপালে মাখতে চাচ্ছেন। এই মুহূর্তে হুমায়ূনের সৌভাগ্যের ঘাটতি যাচ্ছে। ছয় মাস পার হয়েছে, চুনার দুর্গ দখল হয় নি। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর আতশ পুরোপুরি ব্যর্থ। সে নৌকায় কামান বসিয়ে কামান দাগার হাস্যকর চেষ্টা করেছিল। কামান দাগামাত্র গোলার প্রবল বিপরীত ধাক্কায় দু'টি বড় নৌকা কামান এবং বারুদসহ পানিতে ডুবে গেছে। কামানের সঙ্গে তিনজন কামানচিও পানিতে। তারা সাঁতার না জানার কারণে পানির নিচ থেকে উঠে আসতে পারে নি।

পশ্চিম আকাশের মেঘ পরিষ্কার হচ্ছে না, বরং গাঢ় হচ্ছে। ঘন কালো মেঘের যে বিচিত্র সৌন্দর্য আছে তা হুমায়ূন আগে লক্ষ করেন নি। আকাশের এই ছবি এঁকে ফেলতে পারলে ভালো হতো। তাঁর ছবি আঁকার হাত এখনো সেই পর্যায়ে আসে নি। আফসোস!

আলামপনা!

হুমায়ূন পেছনে তাকালেন। জওহর আবতাবচি* সম্রাটের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি হাসি।

---

*আবতাব শব্দের অর্থ পানি। আবতাবচি—যে পানি সরবরাহ করে। সম্রাটকে পানি খাওয়ানোর দায়িত্ব জওহর আবতাবচি'র।

জওহর! সুপ্রভাত।

জওহর লজ্জায় মাথা নিচু করল। সে কিছু বলার আগেই সম্রাট তাকে সুপ্রভাত জানালেন। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

জওহর আমতা আমতা করে বলল, সুপ্রভাত মহান সম্রাট। আমি আপনার জন্যে সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। কিছুক্ষণ আগে রুমী খাঁ দলবল নিয়ে চুনার দুর্গে প্রবেশ করেছে। শের খাঁ'র ছেলে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আমার হৃদয় এই মুহূর্তে আনন্দে পূর্ণ। আমার কাছে তুমি কী উপহার প্রার্থনা কর ?

আপনার স্নেহ। আল্লাহ্‌পাক সাক্ষী, আপনার স্নেহ এবং করুণা ছাড়া আমার আর কিছুই চাইবার নেই। আমি আমৃত্যু আপনাকে পানি খাইয়ে যেতে চাই।

তা-ই হবে। আমি দু'টি রাজকীয় ফরমান জারি করব। কলমচিকে আসতে বলো।

রাজকীয় ফরমানের প্রথমটিতে লেখা হলো, জওহর আবতাবচি আজীবন সম্রাটকে পানি খাওয়ানোর দায়িত্বে থাকবে। তাকে এক হাজারি মসনদদারি দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় ফরমানে রুমী খাঁকে 'মীর আতশ' উপাধি দেওয়া হলো। তাকে চুনার দুর্গের আপাতত দায়িত্ব দেওয়া হলো। দুর্গের বন্দিদের যেন প্রাণহানি না হয়। সম্রাট দুর্গের প্রতিটি বন্দির প্রাণের জিম্মাদার।

ফরমানজারির পর হুমায়ূন এক পেয়ালা বেদানার রস খেলেন। অজু করে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। জওহর সারাক্ষণই সম্রাটের পাশে বসে রইল।

জওহর।

জি আলামপনা।

আমি ছদ্মবেশে কিছুক্ষণের জন্যে শহর ঘুরতে বের হব। হযরত ওমর রাজিআল্লাহুতালা আনহু এই কাজ করতেন।

উনি রাতে বের হতেন। দিনে না।

রাতের আলোয় কিছুই দেখা যাবে না। আমি দিনের আলোয় বের হব। তুমি আমাকে ঘোড়া ব্যবসায়ীর মতো সাজিয়ে দাও। চাদরে আমার ঠোঁট থাকবে ঢাকা। মানুষের পরিচয় লেখা থাকে ঠোঁটে। ঠোঁট ঢাকা মানুষ হলো পরিচয়হীন মানুষ।

পাশাপাশি দু'টি ঘোড়া চলছে। একটিতে সম্রাট হুমায়ূন অন্যটিতে জওহর আবতাবচি। অনেক দূর থেকে তাদেরকে অনুসরণ করছে সম্রাটের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী। তেমন প্রয়োজনে নিমিষের মধ্যে ছুটে এসে তারা সম্রাটকে ঘিরে ফেলবে। ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ালেও সম্রাটের নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা নেই।

শহর শান্ত। দোকানপাট খুলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে। চুনার দুর্গ পতনের কোনো প্রভাব শহরে পড়ে নি। শহরের কেন্দ্রে হরিসংকীর্তন হচ্ছে। সেখানে ছেলেবুড়ো ভিড় করেছে। সম্রাট কিছুক্ষণ হরিসংকীর্তন শুনলেন।

একজন নাগা সন্ন্যাসীকে দেখা গেল। গায়ে ভস্ম মেখে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘুরছে। তাকে ঘিরে একদল ছেলেমেয়ে। নাগা সন্ন্যাসী তার সাধনদণ্ডে কাঁসার একটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিয়েছে। যখন সে হাঁটছে ঘণ্টায় ঢং ঢং শব্দ হচ্ছে। সম্রাট নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে জওহর আবতাবচির মাধ্যমে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তিনি হিন্দুস্থানি ভাষা জানেন না।

আপনি নগ্ন ঘুরছেন কেন?

আমি নাগা সন্ন্যাসী, সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি বলেই নগ্ন।

আপনি তো লজ্জাও বিসর্জন দিয়েছেন। লজ্জা বিসর্জনের জিনিস না।

তোর কাছে না, আমার কাছে লজ্জাও বিসর্জনের।

আপনি গোপন অঙ্গে ঘণ্টা বেঁধেছেন কেন ?

সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যেই ঘণ্টা।

আপনি তো সবই বিসর্জন দিয়েছেন। গোপন অঙ্গও বিসর্জন দিন। এর তো আপনার প্রয়োজন নেই।

আমাকে নিয়ে তুই মাথা ঘামাচ্ছিস কী জন্যে ? তুই ঘোড়া বেচতে এসেছিস, ঘোড়া বিক্রি কর। পুণ্য কামাতে চাইলে আমার সেবা কর।

সম্রাট তাকে দশটা তাম্রমুদ্রা দিয়ে শহরের বাইরে চলে গেলেন। নদীর পাড় ঘেঁসে ঘেঁসে যাচ্ছেন। তাঁর অদ্ভুত লাগছে। মধুর বাতাস। পশ্চিম আকাশের মেঘ এখন ভেলার মতো পুরো আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা তালগাছ বাঁকা হয়ে নদীর দিকে ঝুঁকে আছে। একদল শিশু তালগাছে উঠে সাবধানে মাথা পর্যন্ত যাচ্ছে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ছে। তাদের কী আনন্দ! সম্রাট বললেন, দেখো জওহর। ওদের কী আনন্দ!

জওহর কিছু বলল না। হুমায়ূন বললেন, সম্রাটের পুত্র-কন্যারা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

জওহর বলল, তাঁদের জন্য অন্য আনন্দ। মহান আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন কে কী আনন্দ পাবে। সম্রাট বললেন, চলো এগুই। আরও কোনো আনন্দদৃশ্য হয়তো সামনেই আছে।

সম্রাট এগুলেন। প্রায় দু'ক্রোশ এগুবার পর তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সামনে নলখাগড়ায় ঢাকা শ্মশানঘাট। বৃষ্টির সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্যে চারদিক খোলা শ্মশানবন্ধু ঘর। ঘরভর্তি নানান বয়সী নারী। তারা কলকল করে কথা বলছে।

চারদিক লোকে লোকারণ্য। ঢোল বাজছে, কাঁসার ঘণ্টা বাজছে। কিছুক্ষণ পরপর সবাই মিলে গগনবিদারী চিৎকার দিচ্ছে—সতী মাই কি জয়।

চারজন পুরোহিত আসন করে বসে আছে। মন্ত্রপাঠ চলছে। পুরোহিতদের দক্ষিণ দিকে নদীর কাছাকাছি ডোমরা বসেছে কলসিভর্তি চোলাই মদ নিয়ে। তাদের চোখ রক্তবর্ণ।

সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হচ্ছে?

সতীদাহ হবে আলামপনা। মৃত স্বামীর সঙ্গে তার জীবিত স্ত্রীকে চিতায় পোড়ানো হবে।

এই সেই সতীদাহ! আমি সতীদাহের কথা শুনেছি, আগে কখনো দেখি নি।

দেখার জিনিস না। হিন্দুস্থানি বর্বরতা। চলুন ফিরে যাই।

যে মেয়েটিকে পুড়িয়ে মারা হবে তার সঙ্গে কি কথা বলা যাবে?

আলামপনা। সে কথা বলার মতো অবস্থায় এখন থাকবে না। সবাই তাকে ঘিরে আছে। তাকে নিশ্চয়ই আরক খাওয়ানো হয়েছে। সে এখন নেশাগ্রস্ত।

একদল মানুষ দেখছি লাঠিসোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এরা কারা?

সবসময় দেখা গেছে আগুন লাগানোমাত্র সতী দৌড় দিয়ে চিতা থেকে পালাতে চায়। তখন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাকে চিতায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং আগুনের উপর মেয়েটিকে চেপে ধরে রাখা হয়।

নরকের বর্বরতা।

অবশ্যই।

আমি এই মুহূর্তে ফরমান জারি করে সতীদাহ বন্ধ করতে চাই।

আলামপনা। গুস্তাকি মাফ হয়। আপনার সমস্ত প্রজা হিন্দু। আপনি

ওদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা দিলে তারা বৈরী হয়ে উঠবে। আপনার জন্যে শাসনকার্য পরিচালনা দুষ্কর হবে।

আমি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ঘোড়ার ব্যবসায়ী হিসেবে তারা আপনার সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেবে না।

তাদেরকে তুমি বলো আমি মোঘল সম্রাট হুমায়ূন এবং আমার রক্ষীবাহিনীকে কাছে এগিয়ে আসতে বলো।

চিতায় ঘিয়ের আগুন জ্বলে উঠেছে। সেখানে প্রায় সত্তর বছর বয়সী এক চুলপাকা বৃদ্ধের শবদেহ। তার চুলে আগুন ধরতেই নিমিষে সব চুল জ্বলে গেল। আগুন ভালোমতো জ্বলে উঠলে সতী স্বেচ্ছায় হেঁটে হেঁটে চিতায় উঠবে। তাকে ভাং-এর শরবত খাওয়ানো হয়েছে। তার চিন্তাশক্তি কাজ করছে না। ঢোলের বাদ্য আকাশ স্পর্শ করছে। শ্মশানঘরের তরুণীরা একে একে আসছে। সতী মেয়েটির কপালে সিঁদুর দিচ্ছে। সেই সিঁদুর নিজের কপালে ঘষছে এবং উপুড় হয়ে পড়ে মেয়ের পায়ে পড়ে তাকে প্রণাম করছে। বাজনাদাররা আধাপাগলের মতো নাচছে। হঠাৎ বাদ্যবাজনা থামল। সম্রাট হুমায়ূন এগিয়ে এলেন।

তাঁর ঘোড়া এসে থামল সতীদাহের মেয়েটির সামনে। বারো-তের বছর বয়সী একটি মেয়ে। পরনে লালপেড়ে শাড়ি। গা-ভর্তি অলংকার। কী সুন্দর সরল মুখ, বড় বড় চোখ! ভয়ে আতঙ্কে সে থরথর করে কাঁপছে। মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন সম্রাটের কন্যা আকিকা বেগমের মিল আছে।

তোমার নাম কী? বলো, নাম বলো।

অম্বা।

তোমার স্বামী মারা গেছে। সে চিতায় পুড়ে কয়লা হবে। তুমি তো বেঁচে আছ, তুমি কেন মরবে?

অম্বার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। সে ক্ষীণস্বরে বলল, আমি মরতে চাই না। এরা আমাকে মেরে ফেলবে।

সম্রাট ঘোড়া থেকে নামলেন। অম্বার কাছে এগিয়ে গেলেন। গলা নিচু করে বললেন, আমি নিজের হাতে তোমাকে পানি খেতে দেব। তুমি বিসমিল্লাহ্ বলে সেই পানি খাবে। মনে থাকবে ?

অম্বা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। সে খানিকটা হকচকিয়ে গেছে। মেয়েটির আত্মীয়স্বজন এবং জড়ো হওয়া লোকজন এগিয়ে আসতে চাচ্ছে কিন্তু সম্রাটের রক্ষীবাহিনীর কারণে কাছে আসতে পারছে না। তাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছে। হুমায়ূন তাদের দিকে তাকিয়ে গলা উঁচু করে বললেন, অম্বা নামের এই মেয়েটা এইমাত্র আমার হাতে বিসমিল্লাহ্ বলে পানি খেয়েছে। বিধর্মীর হাতে পানি খাওয়ার কারণে তার জাত গেছে। বিসমিল্লাহ্ বলায় মেয়েটি মুসলমান হয়ে গেছে। আমার আইনে কোনো মুসলমান মেয়েকে সতী হিসেবে দাহ করা যাবে না।

সম্রাট হুমায়ূন অম্বাকে নিয়ে শিবিরের দিকে রওনা হলেন। মাতাল ডোমের দল লাঠিসোটা নিয়ে পিছন পিছন ছুটল। তাদের সঙ্গে পুরোহিতের দল। বাজনাদারদের দল। মহিলাদের দল। 'সতী' কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এ হতে দেওয়া যায় না।

সম্রাটের নির্দেশে তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়ল। অব্যর্থ তীরের আঘাতে চারজন পুরোহিতের তিনজনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হতভম্ব দল উল্টাদিকে দৌড়াতে শুরু করল।

মাগরেবের নামাজের শেষে সম্রাট দরবার বসিয়েছেন। চুনার দুর্গ দখলে এসেছে। দুর্গের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে সেই বিষয়ে পরামর্শসভা বসেছে। বাংলামুলুক অভিযানে কখন রওনা হতে হবে—সেই বিষয়ে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজকের সভা গুরুত্বপূর্ণ। আমীররা সবাই উপস্থিত। রুমী খাঁ (মীর আতশ) উপস্থিত। দরবারে খাসের নিয়ম ভঙ্গ করে চারজন নর্তকী উপস্থিত। এদেরকে আনা হয়েছে চুনার দুর্গ থেকে। গুরুত্বপূর্ণ সভায় নর্তকীরা কখনোই উপস্থিত থাকে না। আজ তারা কেন উপস্থিত বোঝা যাচ্ছে না। নর্তকীরা ভীতসন্তস্ত্র। তারা মাথা নিচু করে আছে। কিছুক্ষণ পরপর একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। একজন গোপনে অশ্রুবর্ষণ করছে।

সম্রাট চুনার দুর্গ দখলে আসার কারণে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। সবাই বলল, আমীন।

আমীর বেগ মীরেক-কে চুনার দুর্গের গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হলো। সবাই বলল, অতি উত্তম সিদ্ধান্ত।

সম্রাট সবাইকে ভোজসভায় আহ্বান জানালেন। মীর আতশ বললেন, অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন মিটিংয়ে নর্তকীরা উপস্থিত। এর কারণ বুঝতে পারছি না।

সম্রাট বললেন, এরা আমার কাছে একটা অভিযোগ করেছে। অভিযোগ গুরুতর। আমার ধারণা অভিযোগ মিথ্যা। যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করে এদের হত্যা করা হবে।

বৈরাম খাঁ বললেন, অভিযোগ কী?

হুমায়ূন বললেন, অভিযোগ হচ্ছে রুমী খাঁ দুর্গে প্রবেশের পরপর সাড়ে তিন শ' মানুষের দুই হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হয়েছে। রুমী খাঁ, এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

রুমী খাঁ বললেন, ঘটনা সত্য। আমি যা করেছি মহান সম্রাটের নিরাপত্তার জন্য করেছি। যে সাড়ে তিন শ' মানুষের দুই হাত কেটে

ফেলা হয়েছে, এরা সবাই দুর্ধর্ষ কামানচি। এরা যেন আর কখনো সম্রাটের বাহিনীর উপর কামান চালাতে না পারে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। শত্রুকে সমূলে বিনাশ করতে হয়।

হুমায়ূন বললেন, আপনাকে সাহসী মানুষ ভেবেছি। আপনি নিতান্তই কাপুরুষের মতো একটি কাজ করেছেন। আমি কাপুরুষ অপছন্দ করি।

যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা একটি সৎ গুণ। অনেক সময় কাপুরুষতা যুদ্ধজয়ে ভূমিকা রাখে।

সম্রাট বললেন, দুর্গের মানুষজন দুর্গ সমর্পণ করেছেন। কাজেই দুর্গ যুদ্ধক্ষেত্র ছিল না। আপনি যে ভয়াবহ অন্যায় করেছেন, তার শাস্তি আপনারও দুই হাত কেটে নেওয়া।

উপস্থিত আমীরদের একজন বললেন, সম্রাটকে আমি তাঁর আদেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধ করছি। সম্রাটের কামানবহর পরিচালনার দায়িত্ব রুমী খাঁর উপর। শের খানের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধযাত্রা করব। যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করবে কামানের উপর। অর্থাৎ রুমী খাঁর নৈপুণ্যের উপর। যার রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট তাকে মীর আতশ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

হুমায়ূন বললেন, যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে মহান আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায়। কাপুরুষ রুমী খাঁর নৈপুণ্যে না। আগামীকাল ফজরের নামাজের পর মীর আতশের দুই হাত কনুই থেকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি।

সম্রাট দরবার ছেড়ে উঠে পড়লেন। মাগরেবের নামাজের সময় হয়েছে। তিনি অজু করার জন্যে উঠে পড়লেন। রুমী খাঁকে গ্রেফতার করে তার তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। রুমী খাঁ সেই রাতেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

অম্বার জায়গা হয়েছে হুমায়ূনের মেয়ে আকিকা বেগমের তাঁবুতে। অম্বা অতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একদিন আগের ঘটনার স্মৃতি কিছুই তার মনে নেই। অম্বা আকিকা বেগমের তাঁবুর জাঁকজমক দেখে হতভম্ব। চারজন খোজা প্রহরী সারাক্ষণ তাঁবু পাহারা দিচ্ছে। আকিকা বেগমের সেবায় নিযুক্ত আছে আটজন দাসী। দু'জন দাসীর হাতে ময়ূরের পালকে বানানো বিশাল পাখা। তারা সারাক্ষণই হাওয়া করছে।

আকিকা বেগম অম্বাকে খুবই পছন্দ করেছে। সে তার সঙ্গে পদ্ম ফুল পাতিয়েছে। আকিকা বেগম তার গলার নীলকান্তমণির মালা অম্বার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। এখন চলছে ধাঁধার আসর। ধাঁধার উত্তর যে দিতে পারবে না, তাকে সঙ্গে সঙ্গে নাকে মাটি ঘষতে হবে। দু'জনের হাতেই মাটির দলা।

আকিকা বলল, দিনে রাজপ্রাসাদে থাকে রাতে থাকে জঙ্গলে, ফজরের ওয়াক্তে থাকে মাটির নিচে। এটা কী ?

অম্বা বলল, জানি না।

আকিকা বলল, মাটি ঘষো।

অম্বা নাকে মাটি ঘষল।

আকিকা বলল, এখন তোমার পালা।

অম্বা বলল, তার এক শ' চোখ। কিন্তু সে চোখে দেখে না।

আকিকা : এক শ' চোখ কিন্তু চোখে দেখে না। আমি জানি না এটা কী।

এর নাম আনারস।

আনারস আবার কী ?

এক ধরনের ফল। বাঙ্গালমুলুকে পাওয়া যায়।

আকিকা বেগম আনারস ফল বাঙ্গালমুলুক থেকে আনার হুকুম দিল। ফল দেখার পর সে নাকে মাটি ঘষবে। আকিকা বেগমের নির্দেশে দু'জন অশ্বারোহী আনারসের সন্ধানে গেল। অম্বা হতভম্ব। বাচ্চা একটি মেয়ের এত ক্ষমতা!

শের খাঁ গোপন বৈঠকে বসেছেন। চুনার দুর্গ হাতছাড়া হওয়ায় তাঁকে মোটেই বিচলিত বলে মনে হচ্ছে না। শের খাঁ'র দুই পুত্র এবং তিনজন সেনাপতি বৈঠকে উপস্থিত। শের খাঁ বললেন, আমি নিশ্চিত সম্রাট হুমায়ূনকে আমরা পরাজিত করব। আমার পরিকল্পনা নির্ভুল। চুনার দুর্গ দখলের জন্যে হুমায়ূন ছয় মাস অপেক্ষা করেছেন। এই ছয় মাস আমি শক্তি সঞ্চয় করেছি। সম্রাটের প্রধান স্তম্ভ রুমী খাঁ গত। এটা আমাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

উপস্থিত সবাই বলল, মার্হাবা।

শের খাঁ বললেন, এখানে উপস্থিত সবার প্রতি আমার একটি কঠিন নির্দেশ আছে। সম্রাট হুমায়ূনকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করা যাবে না।

শের খাঁর পুত্র জলাল খাঁ বললেন, কেন না?

শের খাঁ বললেন, হুমায়ূন আমার পরম শত্রু এটা সত্যি, কিন্তু তিনি এমন শত্রু যাঁকে আমি শ্রদ্ধা এবং সম্মান করি। তিনি মহান মানুষদের একজন। এই মানুষটির অন্তর স্বর্ণখণ্ডের মতো উজ্জ্বল। সেখানে কলুষতার কণামাত্রও নাই।

শের খাঁ'র উজির বললেন, শত্রু সম্পর্কে এমন প্রশংসাসূচক বাক্য দুর্বলতার নামান্তর।

শের খাঁ বললেন, আমি অবশ্যই এই মানুষটির প্রতি দুর্বল। আমি সম্রাটের লেখা একটি কবিতা পাঠ করছি। পাঠ শেষ হওয়ামাত্র

আপনারা বলবেন, মার্‌হাবা।

অশ্ব অশ্বারোহীর বন্ধু নয়।
যেমন বন্ধু নয় বায়ু, মেঘমালার।
বন্ধু হবে এমন যাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবে না।
দু'জনই থাকবে দু'জনের কাছে অদৃশ্য।
দৃশ্যমান থাকবে তাদের ভালোবাসা।

শের খাঁ'র উজির নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, মার্‌হাবা।

হিন্দুস্থানি এক নগ্নগাত্র জাদুকর এসেছে সম্রাটকে ভোজবাজি দেখাতে। তার কোমরের কাছে মালকোঁচা দিয়ে পরা নোংরা ধুতি। মাথায় বিশাল সাদা পাগড়ি। পাগড়ি পরিষ্কার, ঝকঝক করছে। সে কৃশকায়, গাত্রবর্ণ পাতিলের তলার মতো কালো। ভোজওয়ালার সঙ্গে তার কন্যা। বয়স চার-পাঁচ। সেও নগ্নগাত্র। লাল টুকটুকে প্যান্ট পরেছে। মেয়েটির চোখ মায়াকাড়া। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্রাটের দিকে। একবারের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না। তার দৃষ্টিতে ভয় এবং বিস্ময়।

সম্রাট বসেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। পরিবারের বাইরে আছে অম্বা, কিছু পরিচারিকা এবং একদল খোজা প্রহরী।

সম্রাট বললেন, খেলা দেখাও।

বাজিকর সম্রাটকে কুর্নিশ করল। এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তার দুই হাতই খালি, এখন তার ডান হাতে একটা আমের আঁটি দেখা গেল। সে আমের আঁটি মাটিতে পুঁতে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাটি ফুঁড়ে আমগাছ বের হতে শুরু করল। সম্রাট বললেন, সোবাহানাল্লাহ্‌।

বাজিকর গাছের উপর দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে নিতেই দেখা গেল গাছে তিনটা পাকা আম ঝুলছে। বাজিকর আম তিনটা ছিঁড়ে সম্রাটের সামনে রেখে আবারও কুর্নিশ করল। সম্রাট বললেন, মার্‌হাবা। বলেই বিস্ময়ে অভিভূত হলেন—যেখানে আমগাছ ছিল সেখানে গাছ নেই। কুণ্ডলী পাকিয়ে বিষধর গোখরো সাপ বসে আছে। সাপ ফণা তুলেছে। ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে।

মহিলারা অস্ফুট শব্দ করে নড়েচড়ে বসলেন। জাদুকর মাথার পাগড়ি খুলে সাপ ঢেকে দিল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতেই দেখা গেল পাগড়ির ভেতর কোনো সাপ নেই। সাপের পরম শত্রু লালচোখা বেজি বসে আছে। এবার সবাই একসঙ্গে বলল, মার্‌হাবা।

সম্রাট বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবে ? আমি তোমাকে জায়গির দেব। বিশেষ বিশেষ উৎসবে তুমি তোমার খেলা দেখাবে। (সম্রাট কথা বললেন দোভাষীর মাধ্যমে, তিনি হিন্দুস্থানি জানেন না।)

জাদুকর বলল, না।

না কেন ?

নদী অতিক্রম করা আমার জন্যে নিষেধ।

নিষেধ কে করেছেন ?

আমার গুরু।

জাদুকর গুরুর উদ্দেশে আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই হাত জোড় করল। সম্রাট বললেন, জাদু দেখানোর সময় তুমি মন্ত্রপাঠ করেছ। মন্ত্র বলে কি কিছু আছে ?

আছে।

সবচেয়ে কঠিন মন্ত্র কোনটি ?

শূন্যে ভাসা মন্ত্র। এই মন্ত্র পড়লে শূন্যে ভাসা যায়।

তুমি শূন্যে ভাসতে পার ?

আমি পারি না, আমার গুরু পারেন।

জাদুকর আবারও গুরুর উদ্দেশে দুই হাত জোড় করল।

তুমি কী পার ?

আমি পানির উপর হাঁটতে পারি। তবে নদীর পানি না, দিঘির শান্ত পানি। নদীর পানির উপর দিয়ে হাঁটা আমার গুরুর নিষেধ।

তুমি কি পানির উপর দিয়ে হাঁটার জাদু আমাকে দেখাতে পারবে ?

পারব।

চিকিৎসক এবং সম্রাট এই দু'জনের কাছে সর্ব অবস্থায় সত্যি কথা বলতে হয়। তুমি সত্যি করে বলো, পানির উপর দিয়ে হাঁটার কি কোনো কৌশল আছে, না শুধুই মন্ত্র ?

কৌশল আছে।

তুমি কি এই কৌশল আমাকে শিখাবে ?

সম্রাট রাজ্য শাসন করবেন। ভোজবাজি কেন শিখবেন ?

তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার। আমি তোমার ভোজবাজি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি আমার কাছে কী চাও বলো।

আমি ভগবান ছাড়া কারও কাছে কিছু চাই না। আপনি আমার খেলা দেখে খুশি হয়েছেন এতেই আমি খুশি। সম্রাটকে খুশি করতে পারা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি ভাগ্যবান।

সম্রাট তাঁর কন্যা আকিকা বেগমকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আকিকা ছুটে এল।

ভোজবাজির খেলা কেমন লাগল মা ?

খুব ভালো লাগল বাবা।

এই জাদুকর আমাকে খুশি করেছে, আমি তাকে খুশি করতে চাই। কী উপহার পেলে সে খুশি এবং বিস্মিত হবে ?

বাবা, আপনি তাকে একটা হাতি উপহার দিন।

হাতি ?

হ্যাঁ হাতি। উপহার হিসেবে সে হাতি পাবে এটা কখনো কল্পনা করে নি। আপনার উপহার তার কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে।

তোমার সঙ্গে যে হিন্দুস্থানি মেয়েটি আছে সে কেমন আছে ?

খুব ভালো আছে। আনন্দে আছে।

তার নাম যেন কী ?

তার নাম অম্বা।

সে কি তার আত্মীয়স্বজনের কাছে ফেরত যেতে চায় ?

না। আত্মীয়স্বজনরা তাকে ফেরত নেবে না। সে বাকি জীবন আমার সঙ্গে থাকবে। বাবা, আপনি কি জানেন আমরা দু'জন এক বিছানায় ঘুমাই ?

জানতাম না। এখন জানলাম।

আপনি কি রাগ করেছেন ?

আমি আমার আদরের আকিকা বেগমের উপর কখনো রাগ করব না।

আমি যদি কোনো অন্যায় করি তারপরেও না ?

তারপরেও না। তুমি কি কোনো অন্যায় করেছ ?

করেছি। বড় অন্যায় করেছি।

অন্যায়টা কি বলবে ?

না।

আচ্ছা যাও। তোমার বড় অন্যায় ক্ষমা করা হলো।

সম্রাটের নির্দেশে হিন্দুস্থানি জাদুকরকে একটা হাতি উপহার হিসেবে দেওয়া হলো। হতভম্ব জাদুকর এবং তার মেয়েকে হাতির পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হলো। বাচ্চা মেয়েটি আতঙ্কে অস্থির হয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে থাকল।*

---

*হাতির পিঠে হিন্দুস্থানি জাদুকর এবং তার কন্যার মোঘল রীতিতে আঁকা একটি পেইন্টিং ব্রিটিশ জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

শের খাঁ তার সমরবিশারদদের নিয়ে গোপন বৈঠকে বসেছেন। সমরবিশারদদের চারজনের মধ্যে আছে তার দুই পুত্র জালাল খাঁ, সাইফ খাঁ এবং দুই সেনাপতি।

শের খাঁ বললেন, যুদ্ধ শুরুর আগে শত্রুর সবল এবং দুর্বল দিকগুলি খুঁজে বের করতে হয়। সম্রাট হুমায়ূনের সবল এবং দুর্বল দিক কী ?

জালাল খাঁ বললেন, সম্রাট হুমায়ূন ভীরু মানুষ, এটাই তার দুর্বল দিক। তাঁর কামানবাহিনী হলো তাঁর সবল দিক।

পুত্র! তুমি ভুল বললে। হুমায়ূন অসম্ভব সাহসী একজন মানুষ। আমোদপ্রিয়, তবে সাহসী। আর তাঁর বিশাল কামানবাহিনী তাঁর সবচেয়ে দুর্বল দিক।

কেন ?

কামানবহর নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। এত কামান কীভাবে দ্রুত টেনে নেবে ? কামানবহরকে স্থির হয়ে এক জায়গায় থাকতে হয়। বিশাল কামানবহর নিয়ে আক্রমণ করা যায় না। শত্রু প্রতিরোধ করা যায়।

জালাল খাঁ বললেন, আমি এইভাবে ভাবি নি। আপনার কথা সত্য। তবে সম্রাট হুমায়ূন যে কাপুরুষ এই কথাটি সত্য।

তুমি মনে হয় পানিপথের যুদ্ধের কথা ভুলে গেছ। পানিপথে সম্রাট বাবরের ডানবাহুর দায়িত্বে ছিলেন হুমায়ূন। তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছেন। বাহাদুর শাহ'র হাত থেকে তিনি চিতোর কীভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন তাও সম্ভবত তোমার মনে নেই। সম্রাট হুমায়ূন সাহসী, কিন্তু খেয়ালি মানুষ। তাঁর চরিত্রের খেয়ালি অংশই হলো তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আমরা তাঁর এই দুর্বলতাকেই ব্যবহার করব।

কীভাবে ?

শের খাঁ শান্ত গলায় বললেন, নানান খেয়ালে তিনি যেন সময় পার করতে পারেন আমরা সেই চেষ্টা করব। জাদুবিদ্যার একটা প্রাচীন বই

জোগাড় করেছি। সেই বই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বইটি প্রাচীন কোনো অপ্রচলিত ভাষায় লেখা। সম্রাটের সময় যাবে বইটির ভাষা উদ্ধার করতে। আমি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একটা হাতির বাচ্চা জোগাড় করেছি। হাতির বাচ্চার বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সে দু'টা শুঁড় নিয়ে জন্মেছে। সম্রাট দুই শুঁড়ের হাতির বাচ্চা নিয়েও সময় কাটাবেন। আমি কীভাবে শক্তি সংগ্রহ করছি তা তাঁর চোখ এড়িয়ে যাবে।

সাইফ খাঁ বললেন, সম্রাট তো একা না। তাঁর পরামর্শদাতারা আছেন। আমীররা আছেন, অতি বিচক্ষণ সেনাপতি বৈরাম খাঁ আছেন। এঁদের সবার চোখ আমরা কীভাবে এড়াব ?

শের খাঁ অসহিষ্ণু গলায় বললেন, সম্রাট চোখ বুজলে তাঁর অনুসারীদেরও চোখ বুজতে হয় এটাই নিয়ম। সম্রাট এবং তাঁর অনুসারীদের বিভ্রান্ত করার জন্যে আমি কিছু কূটকৌশলের ব্যবস্থাও করেছি।

কী রকম ?

আমি অতি দুর্বল একদল যোদ্ধাকে পাঠাব সম্রাটকে আক্রমণ করার জন্যে। তারা পরাজিত হবে। সম্রাটের ধারণা হবে শের খাঁ'র বাহিনী দুর্বল।

শের খাঁ'র প্রধান সেনাপতি ওসমান বললেন, কৌশলটা ভালো।

সম্রাটের কাছে আমি একটা পত্র পাঠাচ্ছি। এই পত্রেও আমার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

জালাল খাঁ বললেন, কী পত্র পাঠাচ্ছেন আমরা কি শুনতে পারি ?

হ্যাঁ। পত্র আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

হিন্দুস্থানের মালিক,

মহাপরাক্রমশালী সিংহহৃদয় জ্ঞানতাপস মহান

মোঘল সম্রাট বাদশাহ নামদার হুমায়ূন।

অধীন শের খাঁ'র বিনম্র সালাম গ্রহণ করুন।

আস্‌সালামু আলায়কুম।

নিবেদন এই যে, বাদশাহর সম্মানে আমি দু'টি সামান্য উপহার পাঠালাম।

দুই শুঁড়বিশিষ্ট একটি হস্তীশাবক, নাম হরিমতি। এইসঙ্গে জাদুবিদ্যার একটি প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় রচিত গ্রন্থ। জাদুবিদ্যার প্রতি আপনার আগ্রহের কথা জেনেই এমন ক্ষুদ্র উপহার পাঠানোর সাহস করছি।

এখন আপনার প্রতি আমার সামান্য নিবেদন। অধীনের এই নিবেদন আপনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন কি না তা আপনার বিবেচনা। মাঝে মাঝে বৃহৎবপু হস্তীকেও সামান্য মুষিকের কথা শ্রবণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

চুনার দুর্গের পতনের পর আমার দুই বীরপুত্র জালাল খাঁ এবং সাইফ খাঁ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তারা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। যে-কোনোদিন আমার এই দুই পুত্র আপনার সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এর ফলাফল শুভ না হওয়ার কথা। আমার এই দুই পুত্র অসীম সাহসী। প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনায় এই সাহস বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে।

আমার পুত্রদের কাছে মোঘল বাহিনীর পরাজয় হলে হিন্দুস্থানের মালিক সম্রাট হুমায়ূনের জন্যে তা বিরাট কলঙ্ক। আমি সম্রাটকে এই কলঙ্কের বোঝা

নিয়ে দিল্লী প্রস্থানের কথা চিন্তাও করি না। সম্রাটের কলঙ্ক তাঁর দীন সেবক শের খাঁ'র কলঙ্ক।

এখন আমার অনুরোধ (এবং উপদেশ), আপনি অতি দ্রুত দিল্লীর দিকে যাত্রা করুন। আমি আমার ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাকে বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি, পুত্রদের উপর আমার তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনি নিজে একজন মহাবীর, আপনি ভালোই জানেন বীররা নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করে না।

বিনীত

সম্রাটের পদধূলিসম

শের খাঁ

শের খাঁ পত্র পাঠ শেষ করে দুই পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কিছু বলার আছে ?

জালাল খাঁ বললেন, আমরা দুই ভাইয়ের যে-কোনো একজন মোঘলদের সঙ্গে নকল যুদ্ধ করতে যাব এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজিত হব ?

হ্যাঁ।

স্বেচ্ছা-পরাজয়ের ফলাফল হলো মোঘলদের হাতে বন্দি হওয়া।

সে সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

মোঘলদের হতে বন্দি হওয়া মানে হাতির পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ।

এই কথাও ঠিক। বড় মঙ্গলের স্বার্থে ক্ষুদ্র অমঙ্গল গ্রহণ করতে হয়।

সাইফ খাঁ বললেন, নকল যুদ্ধ করতে কে যাবে ?

শের খাঁ বললেন, তুমি যাবে। মূল যুদ্ধে জালাল খাঁকে আমার প্রয়োজন। সে তোমার চেয়ে অনেকগুণ বিচক্ষণ যোদ্ধা।

সাইফ খাঁ বললেন, কবে যুদ্ধে যাব ?

সম্রাট যেদিন এই পত্র পাবেন তার সাত দিন পর।

প্রধান সেনাপতি ওসমান বললেন, আপনার দুই পুত্রের কাউকেই পাঠানোর প্রয়োজন নেই। আপনার সেনাপতিদের একজন যাবে।

শের খাঁ বললেন, তাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তবে সাইফ খাঁ'র ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে যদি ধরাও পড়ে তার পরিচয় পাওয়ার পর হুমায়ূন তাকে আমার কাছে সসম্মানে ফেরত পাঠাবেন। সম্রাট হুমায়ূনের চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে তাঁর করুণা এবং ক্ষমা। আমরা তাঁর এই দুর্বলতা ব্যবহার করব।

শের খাঁ'র উপহার পেয়ে সম্রাট হুমায়ূন উত্তেজিত। জাদুর প্রাচীন বইটিকে স্বর্ণখনি বলে মনে হচ্ছে। তিনি ভাষা পড়তে পারছেন না, তবে বইয়ে অনেক ছবি। ছবিগুলি বইটির বিশেষত্ব বলে দিচ্ছে। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা মানুষের মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করা। তার পরের ছবিতে মুণ্ডু শরীরের সঙ্গে লাগানো। একটা ছবিতে মানুষের শরীরের সঙ্গে বিড়ালের মাথা লাগানো।

সম্রাট হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতদের জড়ো করার নির্দেশ জারি করেছেন। তাদের কেউ-না-কেউ গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করতে পারবে।

দুই শুঁড়ের হস্তীশাবক দেখেও তিনি উত্তেজিত। প্রকৃতির বিশেষ খেয়ালে এরকম একটি হস্তীশাবকের জন্ম হয়েছে, নাকি এটি বিশেষ কোনো প্রজাতির ? বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

হরিমতি এখন আছে আকিকা বেগমের তত্ত্বাবধানে। আকিকা বেগম এবং তার বান্ধবী অম্বা হরিমতিকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আকিকা বেগম হস্তীশাবকের হিন্দু নাম বদলে মুসলমান নাম রাখতে চাচ্ছে। অনেকগুলি নাম সে তাঁর কোরানপাঠ শিক্ষক ওস্তাদের সাহায্যে আলাদা করেছে। কোনোটিই পছন্দ হচ্ছে না। যেমন—

নাম	*অর্থ*
শাহানা	রানী
লাবীবা	জ্ঞানী
আনিসা	কুমারী
সাইয়ারা	রাজকুমারী

সাইয়ারা নাম তার কিছুটা পছন্দ হচ্ছে। কিন্তু সে চাচ্ছে তার নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখতে। আনিসা নাম সেই অর্থে ঠিক আছে। 'আ' দিয়ে শুরু। কিন্তু নামের অর্থ (কুমারী) পছন্দ হচ্ছে না। হরিমতি নিশ্চয়ই সারা জীবন কুমারী থাকবে না।

হরিমতিকে নিয়ে সম্রাটের অন্য পরিকল্পনা আছে। তিনি এই অদ্ভুত হস্তীশাবক পারস্য-সম্রাট শাহ তামাস্পকে উপহার হিসেবে দিতে চান। পারস্য-সম্রাটের জীবজন্তুর প্রতি প্রবল আগ্রহ। তাঁর চিড়িয়াখানা সারা পৃথিবী থেকে খুঁজে আনা জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ। শাহ এই অদ্ভুত উপহার পেয়ে অবশ্যই আনন্দে আত্মহারা হবেন। পারস্যের সঙ্গে তখন সুসম্পর্ক হবে। এর ফলাফল হবে শুভ।

শুক্রবার জুমার নামাজ শেষ করে সম্রাট বিশ্রামে গেছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি দুপুরের খাবার খাবেন। ঘুমে সম্রাটের চোখ লেগে আসছে, তখনই তাঁকে ডেকে তোলা হলো। তাঁকে দুঃসংবাদ দেওয়া

হলো। শের খাঁ'র পুত্র সাইফ খাঁ প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে মোঘল শিবির আক্রমণ করেছে। যুদ্ধের জন্যে মোঘলদের প্রস্তুতি ছিল না বলে অল্পকিছু মোঘল সৈন্য নিহত হয়েছে। সাইফ খাঁ সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে। তাকে বন্দি করা হয়েছে। সাইফ খাঁ'র সঙ্গের সৈন্যদের প্রায় সবাই নিহত হয়েছে।

সাইফ খাঁ-কে সম্রাটের সামনে আনা হলো। সম্রাট দেখলেন নিতান্তই অল্পবয়সী অতি সুপুরুষ এক যুবক।

সম্রাট বললেন, অতি অল্পকিছু সৈন্য নিয়ে তুমি বিশাল মোঘলবাহিনীকে আক্রমণ করেছ। এটা কি তোমার নির্বুদ্ধিতা নাকি কোনো কৌশল ?

সাইফ খাঁ মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বিশাল বাহিনী নিয়েই এসেছিলাম। বেশিরভাগই ছিল ভাড়াটে সৈন্য। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র তারা পালিয়ে গেছে।

বন্দি শত্রুকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে মারার রেওয়াজ মোঘলদের আছে, এই তথ্য তুমি জানো ?

জানি।

তুমি কি আমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাও ?

সাইফ খাঁ বললেন, আপনার করুণা এবং দয়ার কথা আমি জানি। আপনি যে আমার প্রাণ ভিক্ষা দেবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমি এখন দুপুরের খাবার খাব। তুমি আমার সঙ্গে খেতে বসো। খাওয়ার পর তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। আচ্ছা তুমি যেন শান্তিমতো খেতে পার আমি সেই ব্যবস্থা করছি। তোমাকে ক্ষমা করা হলো। তুমি শের খাঁ'র কাছে ফিরে যাবে এবং তাঁকে বলবে তাঁর পাঠানো উপহার আমার পছন্দ হয়েছে।

আমি বাবাকে এই সংবাদ দেব।

সম্রাট বললেন, আমি তোমার পিতার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে দিল্লী ফিরে যাব।

এই খবরও বাবাকে জানাব। তিনি খুশি হবেন।

সম্রাট হুমায়ূন সাইফ খাঁ-কে ডানপাশে বসালেন। অতি সম্মানিতজনকেই এমন সম্মান দেখানো হয়।

জায়গাটার নাম চৌসা। গঙ্গা এবং কীর্তিনাশা নদীর সঙ্গমস্থলে ছোট একটা গ্রাম। চৌসার দক্ষিণে হুমায়ূনের বিশাল বাহিনী আস্তানা গেড়েছে। নদীর একদিকে মোঘল বাহিনী, অন্যদিকে শের খাঁ'র আফগান বাহিনী। মাঝখানে খরস্রোতা কীর্তিনাশা নদী। আফগান বাহিনী নদী পার হয়ে মোঘল বাহিনীকে আক্রমণ করবে সেই সম্ভাবনা শূন্য। নদীতে নড়বড়ে কাঠের পুল আছে। সেই পুলে বিশাল বাহিনী পার হতে পারবে না। পুলের উপর কামান গাড়ি তোলার প্রশ্নই আসে না।

হুমায়ূনের গুপ্তচর খবর এনেছে শের খাঁ পর্যুদস্ত অবস্থায় আছেন। ঝাড়খণ্ডের চেরুহ দলপতি শের খাঁকে আক্রমণ করবে এই নিয়েই শের খাঁ ব্যস্ত। কিছুদিন পরপর নিশাকালে শের খাঁ'র প্রধান সেনাপতি খাওয়াস খাঁ চেরুহ দলপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তার দেখা না পেয়ে ফিরে আসেন। শের খাঁ যে সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তাতে বিশাল মোঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালানোর প্রশ্নই ওঠে না। শের খাঁ চাইবেন যে-কোনো মূল্যে মোঘলদের সঙ্গে সন্ধি।

মোঘল সম্রাট নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটাচ্ছেন। জাদুবিদ্যার বইটির পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা হয়েছে। বইটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সেই ভাষার একজন পণ্ডিত বইটি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ শুরু করে দিয়েছেন। পণ্ডিত হিন্দু ব্রাহ্মণ, নাম আচার্য হরিশঙ্কর বিদ্যাবাচস্পতি। তিনি প্রতি পৃষ্ঠা অনুবাদ করার জন্যে পাচ্ছেন একটি করে রৌপ্যমুদ্রা।

সম্রাট নতুন এক খেয়ালেও কিছু সময় দিচ্ছেন। তিনি হিন্দুস্থানি রান্নার একটি কোষগ্রন্থ তৈরি করতে চাচ্ছেন। বিশাল হিন্দুস্থানের নানান অঞ্চলে কত ধরনের রান্নাই-না হয়। সব একত্রিত থাকলে গবেষকদের জন্যে সুবিধা। হিন্দু বিধবারা (যারা নানান কারণে সতীদাহের হাত থেকে বেঁচে গেছে) মাছ-মাংস খেতে পারে না। তাদের জন্যে বিচিত্র সব নিরামিষ রান্না হয়। বিচিত্র নিরামিষের একটি খেয়ে সম্রাট আনন্দ পেয়েছেন। কাঁঠাল নামের একটি কাঁচা ফল থেকে এই নিরামিষ তৈরি হয়। খেতে মাংসের মতো লাগে। সম্রাট শুরুতে ধরতেই পারেন নি তিনি নিরামিষ খাচ্ছেন, মাংস না। হিন্দুস্থানি রান্নার আকরগ্রন্থ তৈরির বাসনার মূলে আছে কাঁঠালের নিরামিষ।

সম্রাট ঠিক করেছেন, জাদুবিদ্যার বইটির অনুবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চৌসাতে থাকবেন। শের খাঁ'র সঙ্গে সন্ধি করে দিল্লী ফিরে যাবেন। পেছনে শত্রু রাখা কোনো কাজের কথা না।

সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনার জন্যে সম্রাটের দূত শায়েখ খলিলকে শের খাঁ'র কাছে পাঠানো হলো। শর্তগুলো নিম্নরূপ—

প্রথম শর্ত

শের খাঁ তার অবস্থান থেকে পেছনে সরে যাবেন, যাতে ইচ্ছা করলেই মোঘল বাহিনী কীর্তিনাশা নদী পার হতে পারে।

দ্বিতীয় শর্ত

শের খাঁ তার পুরোনো জায়গির বাংলা ও বিহার ফিরে পাবেন ঠিকই, তবে তাঁকে নিয়মিত কর পরিশোধ করতে হবে। তিনি খুৎবা পড়বেন সম্রাট হুমায়ূনের নামে। টাঁকশালের মুদ্রাও মোঘল সম্রাটের নামে তৈরি হবে।

তৃতীয় শর্ত

শের খাঁ'র এক পুত্রকে (সম্রাটের পছন্দ সাইফ খাঁ) থাকতে হবে দিল্লী দরবারে, সম্রাটের নজরদারিতে।

চতুর্থ শর্ত

শের খাঁ স্বয়ং হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তিনি আফগান এবং মোঘল সুসম্পর্কের জন্যে ভূমিকা রাখবেন।

শের খাঁ প্রতিটি শর্ত মেনে নিলেন। নিজের অবস্থান থেকে কুড়ি মাইল পেছনে সরে গেলেন। হুমায়ূনের কীর্তিনাশা নদী অতিক্রমে কোনো বাধা রইল না।

সম্রাট তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে নদী অতিক্রম করলেন না, তবে তিনি সপ্তাহে একদিন নদীর তীরে স্বয়ং উপস্থিত হতে লাগলেন। ওই বিশেষ দিনে দুই শুঁড়ের হস্তীশাবককে গোসল করানো হয়। গোসলের সময় সে তার দুই শুঁড় দিয়ে একসঙ্গে আকাশে পানি ছুঁড়ে মারে। সেই পানি বৃষ্টির মতো তার গায়ে নেমে আসে। অদ্ভুত দৃশ্য।

মঙ্গলবার দ্বিপ্রহর। সম্রাট কীর্তিনাশা নদীর তীরে। হস্তীশাবকের স্নানদৃশ্য দেখছেন। সম্রাটের সঙ্গে আছেন বৈরাম খাঁ। বৈরাম খাঁকে চিন্তিত এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। হস্তীশাবকের জলকেলি দেখে তিনি তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। সম্রাট বললেন, বৈরাম খাঁ, আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি চিন্তিত বলেই মনে হয় চিন্তিত দেখাচ্ছে।

চিন্তিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা কি ঘটেছে?

আমি শের খাঁকে নিয়ে চিন্তিত। সে সাপের মতো ধূর্ত।

সম্রাট হাসতে হাসতে বললেন, সাপ ধূর্ত না, ভীতু প্রাণী। শের খাঁ

যদি সাপও হয় সেই সাপ এখন গর্তে ঢুকেছে। সাপ যখন গর্তে ঢোকে সোজা হয়ে ঢোকে।

বৈরাম খাঁ বললেন, সাপ যখন গর্ত থেকে বের হয় তখন কিন্তু আবার একেবেঁকেই চলে।

এই সাপ সহজে গর্ত থেকে বের হবে না।

বৈরাম খাঁ ক্লান্ত গলায় বললেন, শের খাঁ ছাড়াও চিন্তিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। আপনার ভাই কামরান মীর্জা নিজের নামে খুৎবা পাঠ শুরু করেছেন। নিজের নামে স্বর্ণমুদ্রা বের করেছেন।

সম্রাট বললেন, এটি কামরানের শিশুসুলভ কার্য। শিশুদের সব কাজ গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে নেই। যথাসময়ে সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

এবং আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন ?

হ্যাঁ।

আপনার আরেক ভ্রাতা হিন্দাল মীর্জাকে রসদের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। তিনি কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রসদ সংগ্রহে বের হয়ে আর ফিরে আসেন নি। খবর পাওয়া গেছে তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মনে হচ্ছে তাঁরও দিল্লীর সিংহাসনে বসার বাসনা।

সম্রাট একটি শের আবৃত্তি করলেন। ফার্সি শের, যার ভাবার্থ—

> বৃদ্ধকে সম্মান করো, এই সম্মান তাঁর অভিজ্ঞতার কারণে,
> যুবককে সমীহ করো, এই সমীহ তার তারুণ্যের কারণে,
> শিশুকে ভালোবাসো, এই ভালোবাসা তার শিশুসুলভ কর্মকাণ্ডের জন্যে।

বৈরাম খাঁ বিরস গলায় বললেন, প্রতিটি শের কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ফসল। ব্যক্তিগত কোনো কিছুই সর্বজনীন হতে পারে না। যাই হোক, আমি হস্তীশাবকের স্নান দেখার জন্যে আসি নি। আমি শের খাঁর কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছি। পত্রটি আপনাকে পড়ে শোনানোর জন্যে এসেছি। সম্রাটের অনুমতি পেলে পত্রটি পড়তে চাই।

পড়ুন।

বৈরাম খাঁ পত্রটি পড়লেন :

সিংহের চেয়ে সাহসী, দিল্লীর সূর্য সম্রাট হুমায়ূনের প্রিয়ভাজন, বৈরাম খাঁ।

আমার অভিনন্দন এবং সালাম।

আপনি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে, সন্ধির সকল শর্ত মেনে আমি আমার বাহিনী নিয়ে দূরে সরে গেছি। আমার পুত্র সাইফ খাঁকে নির্দেশ দিয়েছি সে যেন সম্রাটের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করে।

আমি যে-কোনো এক শুভদিনে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হব। তাঁর পদচুম্বনের দুর্লভ সুযোগের আশায় কালযাপন করছি।

এক্ষণ, আপনাকে পত্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ঝাড়খণ্ডের দলপতিদের চোরাগোপ্তা হামলায় আমি বিপর্যস্ত।

সম্রাট হুমায়ূনের দীন সেবক হিসেবে এবং দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি অতি অনুগত ভৃত্য হিসেবে আমি কি আপনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ পেতে পারি ?

ঝাড়খণ্ডের দলপতিদের কীভাবে সমুচিত জবাব দেওয়া যায়—এই বিষয়ে পরামর্শ।

সম্রাটের অনুমতি সাপেক্ষে আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আপনাকে সসম্মানে আমার তাঁবুতে আনার ব্যবস্থা আমি করব।

পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ,

মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের দীন সেবক,

শের খাঁ

সম্রাট বললেন, পত্রের কী জবাব দেবেন বলে ঠিক করেছেন ?

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনি যে জবাব দিতে বলবেন আমি সেই জবাবই দেব।

আমি মনে করি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে আপনি শের খাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

আপনার যদি এরকম নির্দেশ হয় আমি যাব। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি তাঁবুতে ফিরে যেতে চাই। বাংলা মুলুকের প্রচণ্ড তাপে আমি বিপর্যস্ত বোধ করছি।

সম্রাট বললেন, আপনি নিজের তাঁবুতে ফিরে যান। বিশ্রাম করুন।

বৈরাম খাঁ তাঁবুতে ফিরেই শের খাঁ'র পত্রের জবাব দিলেন। সেখানে লিখলেন,

পাঠানদের প্রতিনিধি

শের খাঁ,

আপনার পত্র পাঠ করেছি। আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্রাট হুমায়ূনকে একা ফেলে আপনার কাছে যাওয়া সম্ভব না।

ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক

বৈরাম খাঁ

দিন বৃহস্পতিবার। সময় সুবেহ্ সাদেক।

শের খাঁ তার দুই পুত্র এবং প্রধান সেনাপতি খাওয়াস খাঁকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসেছেন। শের খাঁ বললেন, আজ মধ্যরাতে আমরা মোঘল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কারও কিছু বলার আছে ?

কেউ জবাব দিল না। খাওয়াস খাঁ বললেন, আজকের রাতটা কি বিশেষ কারণে ঠিক করা হয়েছে ?

শের খাঁ বললেন, হ্যাঁ। আমরা মুসলমানরা দিনগণনা করি চন্দ্র দেখে। সেই হিসাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবারের শুরু। শুক্রবারে মুসলমানরা যুদ্ধযাত্রা করে না। মোঘল বাহিনী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাবে। আমরা মুসলমান হয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ব।

খাওয়াস খাঁ বললেন, দিন নির্ধারণ ঠিক আছে।

শের খাঁ বললেন, মোঘল বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হবে এই বিষয়ে আমি একশত ভাগ নিঃসন্দেহ। আমি ঝাড়খণ্ডের দলপতির নামে একটা মিথ্যা গল্প তৈরি করেছি। বারবার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছি। মোঘলরা তা বিশ্বাস করেছে। আমাদের দুটা লাভ হয়েছে। এক. মোঘলদের বিশ্বাস অর্জন। দুই. দ্রুত যুদ্ধযাত্রা করার অনুশীলন।

শের খাঁ'র পুত্র সাইফ খাঁ বললেন, বারবার ঝাড়খণ্ডের দলপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা যে একটি অনুশীলনের অংশ তা আমি আগে বুঝতে পারি নি।

শের খাঁ বললেন, এখন আমি কিছু কঠিন নির্দেশ দেব। এইসব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

প্রথম নির্দেশ

> সম্রাট হুমায়ূনকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা বা গ্রেফতার করা যাবে না। তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

শের খাঁ'র পুত্র জালাল খাঁ বললেন, আপনার এই নির্দেশের পেছনে কারণ কী?

শের খাঁ বললেন, একটিই কারণ। মানুষ হিসেবে আমি সম্রাটকে অত্যন্ত পছন্দ করি। আমি আমার দিক থেকে তাঁর কোনো অমঙ্গল হতে দেব না।

দ্বিতীয় নির্দেশ

সম্রাটের পরিবারের সমস্ত নারী ও শিশু এবং তাঁর হেরেমের নারীদের কোনোরকম অসম্মান বা ক্ষতি করা যাবে না।

তৃতীয় নির্দেশ

যে-কোনো মূল্যে বৈরাম খাঁকে হত্যা করতে হবে। বৈরাম খাঁ সিংহের মতো সাহসী আবার শৃগালের চেয়েও ধূর্ত। বৈরাম খাঁ বিহীন হুমায়ূন কোনো শক্তিই না।

শের খাঁ বললেন, এখন খাওয়াস খাঁ'র দায়িত্ব হলো বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাড়খণ্ডের চেরুহ দলপতির বিরুদ্ধে মিথ্যা যুদ্ধযাত্রা করা। সম্রাট হুমায়ূন যেন খবর পান আপনি দলপতিকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছেন—আমি সেই ব্যবস্থা করব। আপনি সন্ধ্যা নামার পর ফিরে আসবেন।

খাওয়াস খাঁ বললেন, আমি কি এখনই যাত্রা করব?

শের খাঁ বললেন, এই মুহূর্তে।

ভোরবেলা নাশতা খেতে খেতে হুমায়ূন শুনলেন, শের খাঁ'র বিশাল বাহিনী খাওয়াস খাঁ'র নেতৃত্বে চেরুহ দলপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে।

হুমায়ূন দুঃখিত গলায় বললেন, শের খাঁ বেচারা ভালো ঝামেলায় আছে।

সারাটা দিন সম্রাটের আনন্দে কাটল। তিনি তাঁর কন্যা আকিকা বেগমের সঙ্গে পাশা খেললেন। আকিকা বেগম পাশা খেলায় পিতাকে হারিয়ে দিলেন। সম্রাট কন্যার কাছে হেরে প্রভূত আনন্দ পেলেন। তিনি একটি শের আবৃত্তি করলেন। এই শেরটির ভাবার্থ—

> সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যে বুদ্ধিতে নিজ পুত্র-কন্যার
> হাতে পরাস্ত হয়।

আকিকা বেগম বলল, বাবা, আমি তোমাকে বুদ্ধিতে হারাই নি। পাশার দানে হারিয়েছি।

হুমায়ূন হাসতে হাসতে বললেন, একই ব্যাপার।

অম্বা মেয়েটির সঙ্গেও কিছু কথা বললেন। হুমায়ূন বললেন, আমার এখানে তুমি কি সুখে আছ ?

অম্বা বলল, মহা সুখে আছি। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আরও চিন্তা করো।

সম্রাট দুপুরে আচার্য হরিশংকরের সঙ্গে বসলেন। তাঁর অনুবাদ শুনলেন। সর্বমোট দশ পৃষ্ঠা অনুবাদ হয়েছে। সম্রাট আচার্যকে দশটি রৌপ্যমুদ্রা দিলেন।

মাগরেবের নামাজের পর কোনোরকম খবর না দিয়ে সম্রাট উপস্থিত হলেন জেনানা তাঁবুতে। মহিলারা অভিভূত। অনেকদিন তাঁরা সম্রাটের দর্শন পায় না।

হুমায়ূন বললেন, দিল্লী ফিরে গেলে কেমন হয় ?

সবাই একসঙ্গে বলল, খুব ভালো হয়।

আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লীর দিকে রওনা হব।

মহিলাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁদের আগ্রহে সম্রাট রাতের খাবার জেনানা তাঁবুতে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাতের খাওয়ার শেষে গানবাজনার আয়োজন করা হলো।

আনন্দেরও এক ধরনের ক্লান্তি আছে। সম্রাট সেই ক্লান্তি নিয়ে রাতে ঘুমুতে গেলেন।

শের খাঁ'র বাহিনী কীর্তিনাশা নদীর উপরের কাঠের পুল দিয়ে পার হলো। শের খাঁ বিস্মিত হলেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি পুল, সেখানে কোনো পাহারা নেই। শের খাঁ'র হস্তীবাহিনী কীর্তিনাশা সাঁতরে পার হলো।

মোঘল বাহিনীর পেছনে শের খাঁ'র সৈন্যদল। মোঘলরা আছে কীর্তিনাশা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে। পাঠানদের আক্রমণ শুরু হলে মোঘলদের যেতে হবে নদীর দিকে। শের খাঁ'র নির্দেশে কীর্তিনাশার কাঠের পুল ভেঙে দেওয়া হলো।

শের খাঁ'র বাহিনী ঘুমন্ত মোঘল সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোঘল অশ্বারোহীরা তাদের অশ্বের পিঠে জিন পরানোর সময়ও পেল না।

সম্রাটের ঘুম ভাঙল 'পালাও' 'পালাও' চিৎকারে। সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে ?

জওহর আবতাবচি ভীত গলায় বলল, আমরা শের খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছি এবং পরাজিত হয়েছি। মোঘল সৈন্যদের প্রায় সকলেই হত।

সম্রাট বললেন, আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি ?

জওহর আবতাবচি বলল, না। সম্রাট, আপনাকে এক্ষুনি পালাতে হবে।

আহত মোঘল সেনাদের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছে। মহিলা এবং শিশুদের কান্না শোনা যাচ্ছে।

হুমায়ূন ভেবে পেলেন না, তাঁর তাঁবু কেন আক্রান্ত হয় নি। শের খাঁ'র উচিত ছিল সবার আগে সম্রাটকে হত্যা করা। এখানে কি শের খাঁ'র কোনো হিসাব আছে ?

সম্রাট ঘোড়ায় চড়ে কীর্তিনাশা নদীর পাড়ে গেলেন। পুল ভাঙা। শত শত মোঘল সৈন্য পুলে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ছে। নদীর স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। হাতিগুলিরও মনে হয় মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। তারা কিছুতেই পানিতে নামবে না। অথচ এরা শিক্ষিত হাতি। যুদ্ধক্ষেত্রের সব পরিস্থিতির জন্যে তৈরি।

হুমায়ূন পেছন দিকে তাকালেন, তাঁর তাঁবুতে আগুন জ্বলছে। আগুন ছুটে যাচ্ছে জেনানা তাঁবুর দিকে। আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ লাল। সম্রাট হুমায়ূনের ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে আযান দিচ্ছেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। মহাবিপদের সময় আযান দিতে হয়। আজ মোগলদের মহাবিপদ।

সম্রাট ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া পানিতে তলিয়ে গেল। সম্রাট নিজেও তলিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন, কে যেন বলছে আমি আপনার দিকে একটা বাতাসভর্তি মশক ছুঁড়ে দিচ্ছি। আপনি মশক ধরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করুন।

তুমি কি আমাকে চেনো ?

আপনি মোঘল সম্রাট হুমায়ূন।

তোমার নাম কী ?

আমি নাজিম। ভিস্তিওয়ালা নাজিম। আপনি মশক শক্ত করে ধরে ভাসতে থাকুন।

নদীর প্রবল স্রোতে হুমায়ূন ভেসে যেতে শুরু করেছেন। তিনি দূর থেকে বললেন, আমি যদি বেঁচে যাই, যদি দিল্লীর সিংহাসনে বসতে পারি তাহলে তোমার সৎকর্মের প্রতিদান আমি দেব। একদিনের জন্যে হলেও তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসবে।

ভোর হয়েছে।

হুমায়ূন-পত্নী বেগা বেগম শের খাঁ'র হাতে বন্দি হয়েছেন। ভয়ে এবং আতঙ্কে তিনি অস্থির। পরাজিত সম্রাটের স্ত্রীর জন্যে কী অসম্মান অপেক্ষা করছে তা তিনি জানেন। রাজপুত রমণীরা এমন অবস্থায় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জহরব্রত পালন করেন। মুসলমানদের জন্যে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ বলে এমন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।

বেগা বেগমকে শের খাঁ'র সামনে উপস্থিত করা হলো। শের খাঁ বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন ?

বেগা বেগম বললেন, অসম্মানের ভয়ে কাঁদছি।

মা, শুনুন। আপনি যা ইচ্ছা করবেন তা-ই করা হবে। আমি আপনাকে মা ডেকেছি। পুত্রের হাতে মা'র কোনো অসম্মান হবে না এটা আপনি জানেন। আপনি কী চান বলুন ?

আমি দিল্লী যেতে চাই।

আপনাকে এবং আপনার সঙ্গে যেসব মহিলা এবং শিশু আছে তাদের সবাইকে আমি এক্ষুনি দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

সম্রাট হুমায়ূনের নয়নমণি আকিকা বেগম এবং তার এক বান্ধবী অম্বাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি তাদের সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছি। মা, আপনার আর কিছু কি লাগবে ?

বেগা বেগম বললেন, অজুর পানি লাগবে। জায়নামাজ লাগবে। আমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ব।

নফল নামাজ শেষে প্রার্থনায় বসে হুমায়ূন-পত্নী বেগা বেগম বললেন, হে পরম করুণাময়, তোমার বান্দা শের খাঁ যে সম্মান আমাকে দিয়েছে সেই সম্মান তুমি তাঁকে বহুগুণে বর্ধিত করে ফেরত দিয়ো। হুমায়ূন-পত্নী হয়েও আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, শের খাঁ যেন তার জীবনে কখনোই কোনো যুদ্ধে পরাজিত না হয়।*

শুক্রবার। জুম্মার নামাজের সময় হয়েছে। শের খাঁ'র হাতে বন্দি সম্রাট হুমায়ূনের ইমামকেই নামাজ পড়াতে বলা হলো। ইমাম খুৎবায় হুমায়ূনের নাম নিলেন।

শের খাঁ বললেন, খুৎবা পাঠে সামান্য ভুল হয়েছে। ভুল কী হয়েছে ইমাম সাহেব জানেন। তাঁকে নতুন করে খুৎবা পাঠ করতে বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফায় খুৎবায় শের খাঁর নাম পাঠ করা হলো। নামাজের শেষে শের খাঁ নিজেকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করে 'শাহ্' উপাধি গ্রহণ করলেন। শের খাঁ হলেন শের শাহ্।

---

* চৌসার যুদ্ধের পর শের খাঁ কখনোই কোনো যুদ্ধে পরাজিত হন নি। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নিজের একটা কামানের বিস্ফোরণে।

আপনি খুশি না আয়ে
না আপনি খুশি চলে,
লাই হায়াত আয়ে, কাজা লে চলি চলে।
(পৃথিবীতে নিজের খুশিমতো আসি নি, খুশিমতো চলেও
যাব না। জীবন হাত ধরে নিয়ে এসেছিল বলেই এসেছি।
মৃত্যু হাত ধরে নিয়ে চলে যাবে, তখন চলে যাব।)

সম্রাট হুমায়ূন মশক বুকে জড়িয়ে গঙ্গা নদীর তীরে শুয়ে আছেন। কখন নদীর স্রোত তাঁকে তীরে এনে ফেলেছে, তিনি জানেন না। অবসাদে, ক্লান্তিতে, হতাশা ও বিষণ্ণতায় তাঁর চোখ বন্ধ। তিনি ঘুম এবং জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় আছেন। তাঁর চোখের পাতা বন্ধ। সেই বন্ধ পাতা ভেদ করেও সূর্যের আলো তাঁর চোখে ঢুকে যাচ্ছে। চোখ কটকট করছে, কিন্তু তিনি মাথা ফেরাতে পারছেন না।

আপনার কী হয়েছে ?

সম্রাট অনেক কষ্টে চোখ মেললেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এক রমণী কলসি হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। সে গঙ্গার পানি নিতে এসেছিল। রমণীর বয়স অল্প। মুখশ্রী কোমল।

আপনি কে ?

সম্রাট বললেন, আমি বাদশাহ হিন্দুস্থান।

রমণী বলল, বাদশাহ হিন্দুস্থান থাকবেন সিংহাসনে। কাদাপানিতে না।

পায়ে সামান্য কাঁটা ফুটলেও হাতির মতো প্রাণী অচল হয়ে যায়। আমি পায়ে কাঁটা-ফোটা হাতি। তুমি কি আমাকে কোনো খাবার দিতে পার ?

আমার ঘরে ছাতু ছাড়া কিছু নেই। গুড় দিয়ে ছাতু মেখে দিলে খেতে পারবেন ?

পারব। কিছু দুধ কি জোগাড় করতে পারবে ? আমার শরীরের এই অবস্থায় দুধ বলকারক।

দুধের ব্যবস্থা করতে পারব।

তুমি যে সেবা আমাকে করবে তা হাজার গুণে আমি ফেরত দেব। আমি ঋণ রাখি না। তোমার নাম কী ?

লছমি বাই। আমি বুঝতে পারছি আপনার নড়াচড়ার শক্তিও নেই। আপনি শুয়ে থাকুন। আমি খাবার এবং লোকজন নিয়ে আসছি।

শুকরিয়া। আমি যে হিন্দুস্তানের সম্রাট এটা কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না। আপনি এক দুর্ভাগা মজনুন (পাগল)।

ভালো বলেছ, আমি এক দুর্ভাগা মজনুন।

লছমি বাই চলে গেল। তাঁর গায়ের উপর দিয়ে একটা শকুন চক্কর খাচ্ছে। এটা অলক্ষণ। শকুন আগেভাগে মৃত্যুর খবর পায়। এই শকুনটা কি বুঝে ফেলেছে তিনি মারা যাচ্ছেন ? ক্লান্ত অবসন্ন সম্রাট উড়ন্ত শকুন দেখতে দেখতে আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন।

বটগাছের নিচে দু'জন মোঘল চিন্তিত ভঙ্গিতে বসা। শের শাহ্'র একদল সৈন্য বটগাছ ঘিরে আছে। তাদের কাছে খবর আছে এই দুজনের একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি বৈরাম খাঁ। বৈরাম খাঁকে হত্যা করে তার কাটা মাথা শের শাহ্-কে দেখাতে হবে।

তোমাদের মধ্যে কে বৈরাম খাঁ ?

দুজনই বলল, আমি বৈরাম খাঁ।

দু'জনের একজন বৈরাম খাঁ। অন্যজন আবুল কাশেম খাঁ। তিনিও সম্রাট হুমায়ূনের একজন সেনাপতি।

তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যা কথা বলছ। সে কে? আঙুল তুলে দুজনই একে অন্যকে দেখালেন।

বৈরাম খাঁ'র চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন। ছোটখাটো মানুষ। মুখের চামড়া কুঁচকানো। মাথার চুল খাবলা খাবলা করে উঠে গেছে। অন্যদিকে কাশেম খাঁ অসম্ভব রূপবান। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যে ঝলমলে একজন মানুষ। কাশেম খাঁ'র মাথায় একটাই চিন্তা—যে-কোনোভাবেই হোক বৈরাম খাঁকে রক্ষা করতে হবে। অসহায় সম্রাট হুমায়ূনের এই মুহূর্তে বৈরাম খাঁকে দরকার। আবুল কাশেম খাঁকে না পেলেও সম্রাটের চলবে।

কাশেম খাঁ শের শাহ্'র সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না কে বৈরাম খাঁ? ওই উজবুকটা আমার নফর। সে মুনিবের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে বৈরাম খাঁ সেজেছে। তার কত বড় স্পর্ধা!

শের শাহ্'র সৈন্যদের কাশেম খাঁ'র কথা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। তারা সঙ্গে সঙ্গেই কাশেম খাঁকে হত্যা করে তার কাটা মুণ্ডু নিয়ে উল্লাস ধ্বনি করতে করতে শের শাহ্'র তাঁবুর দিকে রওনা হলো। আসল বৈরাম খাঁ'র দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।

ইতিহাস কাউকে কাউকে মনে রাখে আবার কাউকে রাখে না। বৈরাম খাঁ'র বীরত্বগাথা ইতিহাস মনে রেখেছে। কাশেম খাঁ'র বীরত্বগাথা মনে রাখে নি।

প্রবল জ্বরে হুমায়ূন ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন। তিনি গঙ্গা নদীর তীরেই কাদামাখা অবস্থায় পড়ে আছেন। বর্ষার ক্লান্তিহীন বর্ষণ হচ্ছে। নদীর

পানি ফুলে ফেঁপে উঠছে। পানি উঠে এসেছে কোমর পর্যন্ত। ধুপ ধুপ শব্দে নদীর পাড় ভাঙছে। হুমায়ূনের ধারণা হলো, পাড় ভেঙে তিনি আবারও নদীতে পড়বেন। এবার পড়লে আর রক্ষা নেই। মশকের বাতাস বের হয়ে গেছে। সম্রাট চেষ্টা করলেন হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে। পারলেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার শকুনটা এখনো আছে। তার মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। এই পাখিটির কাছে জীবন্ত প্রাণী অর্থহীন। মৃত প্রাণীই শুধু অর্থবহ। তিনি আবারও জ্ঞান হারালেন। অচেতন অবস্থায় তাঁর মনে হলো আকিকা বেগম তাঁকে ডাকছে—পিতাজি পিতাজি। তাঁর মেয়ে কখনো তাঁকে পিতাজি ডাকে না। আজ কেন ডাকছে? তাঁকে পিতাজি ডাকে অম্বা নামের মেয়েটা। আকিকা কি অম্বার কাছ থেকে পিতাজি ডাক শিখেছে?

হুমায়ূনের কন্যা আকিকা বেগম এবং অম্বা আছে আচার্য হরিশংকরের সঙ্গে। হরিশংকর এই দুজনকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। হরিশংকর বলেছিলেন, তোমরা আমার দুই কন্যা। আমার জীবন থাকতে তোমাদের কিছু হবে না। আমি তোমাদের লুকিয়ে রাখব। পরিস্থিতি শান্ত হলে দিল্লী পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

হরিশংকর অম্বাকে তার গ্রামের মানুষদের হাতে তুলে দিলেন। সহমরণ থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে হলো কলঙ্কের কলসি। এই কলসি চূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। যারা এই কাজে সাহায্য করবে তারা সবাই পুণ্যের ভাগ পাবে। হরিশংকরের পুণ্য প্রয়োজন।

গঙ্গার তীরে রাতারাতি আগুন করে জ্বলন্ত অগ্নিতে অম্বাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ভয়াবহ চিৎকারে অম্বা ডাকল, আকিকা। আকিকা।

আকিকা বেগম বান্ধবীকে বাঁচানোর জন্যে দৌড়ে আগুনে ঢুকে গেল। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করছে। সেই আগুনের

ভেতর দুই বান্ধবী দুজনকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছে, পিতাজি! পিতাজি!

সম্রাট অচেতন জগৎ থেকে চেতন জগতে ফিরলেন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি মাটির ঘরে দড়ির এক চৌপায়ায় শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে দুর্গন্ধ কাঁথা। মাথার কাছে কুপি জ্বলছে। কুপি থেকে বুন্‌কা বুন্‌কা কালো ধোঁয়া উঠে ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে। গালভাঙা এক প্রৌঢ় খালি গায়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে। প্রৌঢ় তাঁর পায়ে তেল ঘষছে। চার-পাঁচ বছর বয়সের এক উলঙ্গ ছেলে কুকুরের মতো হামাগুড়ি দিয়ে বসে একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভেতর চুলা জ্বলছে। মাটির হাঁড়িতে কিছু রান্না হচ্ছে। ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে। গঙ্গার পাড়ে দেখা হওয়া তরুণীই রাঁধছে। তরুণীর নাম সম্রাটের মনে পড়ল—লছমি বাই।

সম্রাটকে চোখ মেলতে দেখেই তরুণী প্রৌঢ়কে চোখে ইশারা করল। প্রৌঢ় এগিয়ে এসে সম্রাটের মাথা তুলে ধরল। লছমি মাটির ভাঁড় সম্রাটের মুখের কাছে ধরে বলল, মহিষের গরম দুধ। খেলে বল পাবেন।

হুমায়ূন দুধ পান করলেন। হ্যাঁ এখন কিছুটা ভালো লাগছে। সম্রাট বললেন, জায়গাটার নাম কী?

বীরভূম।

গ্রামের নাম কী?

নোকরা।

এই নামগুলি মনে রাখতে হবে। সম্রাট ঠিক করেছেন, তিনি যদি দিল্লীতে ফিরে আবার সিংহাসনে বসতে পারেন তাহলে হতদরিদ্র এই পরিবারের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন। এই কারণেই নামগুলি মনে রাখা

দরকার। তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, লছমি বাই, বীরভূম, নোকরা। লছমি বাই, বীরভূম, নোকরা। লছমি বাই, বীরভূম, নোকরা...

সম্রাটের কথায় বাচ্চা ছেলেটা মজা পেয়ে হেসে উঠতেই প্রৌঢ় এসে সশব্দে তার গালে চড় দিল। চড় খেয়েও বাচ্চাটির কোনো ভাবান্তর হলো না। তার মুখ এখনো হাসি হাসি।

আচার্য হরিশংকর ভীত চোখে তাকিয়ে আছেন শের শাহ্'র দিকে। শের শাহের লোকজন তাঁকে ধরে এনেছে।

শের শাহ্ বললেন, সম্রাটের মেয়ে আকিকা বেগম কোথায় ?

হরিশংকর বললেন, আমি জানি না। জেনানা মহলে যখন হইচই শুরু হলো সে ছুটে গেল নদীর দিকে। আমার ধারণা সে নদীতে ডুবে মরেছে।

তোমার সঙ্গে একটা পুঁটলিতে বেশ কিছু ধনরত্ন পাওয়া গেছে। এগুলি কোথায় পেয়েছ ?

সম্রাট হুমায়ূন উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছেন।

ধনরত্নের মধ্যে কানের দুল আছে, গলার হার আছে। এগুলি কি তিনি তোমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন ?

আমার এক কন্যার জন্যে এইসব উপহার।

আমি যে এখন দিল্লীর সম্রাট এটা কি জানো ?

জানি।

সম্রাটের সামনে মিথ্যা বলা যায় না এটা জানো ?

হরিশংকর চুপ করে রইলেন।

শের শাহ্ বললেন, হুমায়ূনের মেয়ে আকিকা বেগমের মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী। তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিলাম। তুমি জ্ঞানী মানুষ। আমি জ্ঞানকে সম্মান করি। কাজেই তোমাকে একটা বিশেষ সুবিধা আমি দেব।

সম্রাট শের শাহ্'র অনেক দয়া।

শের শাহ্ বললেন, হ্যাঁ আমার অনেক দয়া। তবে পরাজিত মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের মতো দয়া আমার নেই। তোমাকে যে বিশেষ সুবিধা আমি দেব তা হলো কোন পদ্ধতিতে তুমি মৃত্যু চাও তা তুমি ঠিক করবে। আমার হাতে অনেক পদ্ধতি আছে। যেমন—

১. হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু।

২. শূলদণ্ড।

৩. তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটে আলাদা করা।

৪. আগুনে পুড়ে মৃত্যু।

হরিশংকর শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শের শাহ্ বললেন, তুমি নিজে যদি তোমার পছন্দের কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে মরতে চাও তাও করা হবে। বলো কী পদ্ধতিতে মরবে?

হরিশংকর কিছু বলতে পারলেন না। শের শাহ্ তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়ে দলবল নিয়ে বের হলেন—সম্রাট হুমায়ূনের খবর পাওয়া গেছে। গ্রাম নোকরা, জেলা বীরভূম।

লছমি বাইয়ের বাড়ি শের শাহ্'র সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে। লছমি বাইকে আনা হয়েছে শের শাহ্'র সামনে। শের শাহ্ ঘোড়ার উপর বসে আছেন। তাঁর দুইপাশে দুই পুত্র। তারাও ঘোড়ার পিঠে। শের শাহ্ বললেন, তোমার নাম?

লছমি বাই।

হুমায়ূন কোথায়?

জানি না।

তুমি তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করেছ?

হ্যাঁ।

তুমি কি তাঁর পরিচয় জানতে?

উনি নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি নাই।

হুমায়ূন কোন পথে পালিয়েছেন?

লছমি জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

তিনি কোন দিকে গেছেন তা জেনেও যদি না বলো তাহলে তোমার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। এখন বলো।

আমি বলব না।

শের শাহ্ তার বড় পুত্র জালাল খাঁ'র দিকে তাকিয়ে বললেন, হুমায়ূন নামের ওই মানুষটার কী অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ করেছ? মেয়েটি কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছিল। এই কিছুক্ষণেই তার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। সে হুমায়ূনকে রক্ষা করবে, বিনিময়ে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এই ঘটনা আমাদের জন্যে ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ কেন?

জাদুকরী ক্ষমতার হুমায়ূনের মতো মানুষরা যা কিছু হারায় সবই ফিরে পায়। মানুষের ভালোবাসার কারণে ফিরে পায়। মানুষের ভালোবাসা আমরাও যেন ফিরে পাই সেই চেষ্টা এখন থেকেই করতে হবে।

জালাল খাঁ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। শের শাহ্ লছমি বাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একজন অসুস্থ, হতাশ এবং ভগ্নহৃদয় মানুষকে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করেছ। তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করেছ। মানুষটি আমার শত্রু হলেও তোমার আচরণে আমি খুশি। এই স্বর্ণমুদ্রাটি রাখো। আমার বকশিশ।

লছমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না। লছমি বাইয়ের স্বামী মুখভর্তি হাসি নিয়ে এগিয়ে এল।

সম্রাট হুমায়ূন নদীপথে আগ্রার দিকে রওনা হয়েছেন। অতি সাধারণ মাছ ধরার নৌকা। নৌকার মাঝি তিনজনই বলশালী। তারা আরোহীর পরিচয় জানে না।

হুমায়ূন দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। কয়েকবারই তাঁর মনে হলো, পৃথিবী এত সুন্দর কেন ? তাঁর হাতে কাগজ-কলম নেই, তিনি মনে মনে একটি শের রচনা করলেন। শেরটির ভাবার্থ—

আমরা বাস করি সুন্দরের মধ্যে
সুন্দরকে ঘিরে থাকে অসুন্দর।
যেমন পুণ্যের চারদিকে থাকে
পাপের শক্ত খোলস।
ভাগ্যবান সেইজন যে অসুন্দরের পর্দা ছিঁড়ে
সুন্দর দেখে। পুণ্যের কাছে যায় পাপের
শক্ত খোলস ভেঙে॥

সম্রাট নৌকার পাটাতনে শুয়ে আছেন। আকাশ মেঘে ঢাকা। হিন্দুস্থানের কঠিন রোদ এখন আর তাঁর চোখে লাগছে না। আরামদায়ক বাতাসে চোখ বুজে আসছে। তাঁকে ঘুমুলে চলবে না। জেগে থাকতে হবে।

তিনি চোখ বন্ধ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে লাগলেন। শের শাহ্‌কে অতি দ্রুত পরাজিত করতে হবে। তিনি কি ভাইদের সাহায্য পাবেন ? অবশ্যই পাবেন। ভাইদের প্রতি স্নেহ এবং মমতার কোনো অভাব তিনি দেখান নি। সাধারণ নিয়মে সিংহাসনে বসার পরপর ভাইদের হত্যা করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে। তিনি তা করেন নি। তিনি পিতার আদেশ মনে রেখেছেন।

মৃত্যুর আগে সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ূন মীর্জার হাত ধরে বলেছিলেন, আমার মন বলছে তোমার ভাইরা তোমাকে অনেক যন্ত্রণা দেবে, তারপরেও তুমি তাদের প্রতি কোমল থাকবে। যে ভাইদের প্রতি

কোমল থাকে, আল্লাহ্পাক তার প্রতি কোমল থাকেন। নৌকার মাঝির কথায় তাঁর চিন্তা বাধাগ্রস্ত হলো।

নৌকার মাঝি বলল, হুজুর, বিশাল একটা নৌকা আমাদের পিছনে পিছনে আসছে। আমাদের থামতে ইশারা করছে। আমরা কি থামব ?

হুমায়ূন শুয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে কোনো জবাব নেই।

নৌকার মাঝি বলল, ওই নৌকায় সৈন্য আছে। আমরা না থামলে বিরাট সমস্যা হবে।

শের শাহ্'র সৈন্য ?

মাঝি বলল, সে রকমই অনুমান করি। চারদিকেই এখন শের শাহ্'র সৈন্য।

হুমায়ূন বললেন, ছোট কোনো খালে নৌকা ঢুকিয়ে দিতে পার ?

পারি। তাতে লাভ হবে না। আমরা ওদের নজরের মধ্যে আছি। খালে নৌকা ঢোকালে ওরাও খালে ঢুকবে।

হুমায়ূন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

হুজুর! ওরা খুব কাছে চলে এসেছে।

হুমায়ূন হতাশ গলায় বললেন, আসুক। আর তখনই শুনলেন ওই নৌকা থেকে কে একজন বলছে—হিন্দুস্থানের মহান সম্রাট হুমায়ূন কি নৌকায় আছেন ?

কণ্ঠস্বর হুমায়ূনের পরিচিত। অবিকল বৈরাম খাঁ'র গলা। প্রচণ্ড মানসিক চাপে মানুষের মাথা এলোমেলো হয়ে যায়, তখন সে নানান ধরনের ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। তাঁর বেলাতেও কি এরকম হয়েছে ?

সম্রাট উঠে বসলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, পনেরোজনের মতো মোঘল সৈন্য নিয়ে বৈরাম খাঁ নৌকায় দাঁড়ানো।

সম্রাটের চোখে পানি এসে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, বৈরাম খাঁকে পেয়েছি। আমার আর কোনো ভয় নেই।

বৈরাম খাঁ। ভালো আছেন ?

সম্রাট ভালো থাকলেই আমি ভালো।

আপনাকে দেখে আমি বুকে এক শ' হাতির বল পাচ্ছি। আল্লাহ্‌পাকের দরবারে হাজার শুকরিয়া। নৌকার তিন মাঝি হতভম্ব হয়ে তাকাচ্ছে। তারা ঘটনা কিছুই বুঝতে পারছে না।

হরিশংকরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন। বৃষ্টির পানিতে কাঠ ভেজা থাকায় আগুন ধরাতে সমস্যা হচ্ছিল। কাঠে তার্পিন এবং গালা ঢেলে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এখন সুন্দর আগুন জ্বলছে। হরিশংকর মন্ত্রমুগ্ধের মতো জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে আছেন। অগ্নিমন্ত্র পাঠ করে সাধু-সন্তরা আগুন নেভাতে ও জ্বালাতে পারেন। হরিশংকর জানেন তিনি সাধু-সন্তদের একজন না। অগ্নিমন্ত্র তাঁর ক্ষেত্রে কাজ করবে না, তারপরেও তিনি অগ্নিমন্ত্র জপ করার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই মন্ত্রের প্রথম চরণ মনে এল না, মাঝখানের একটা লাইন শুধু মাথায় আসছে—

'যা অগ্নিদায়েনো নমঃ ভূপে...'

এই সময় হঠাৎ করে বিরাট হইচই শুরু হলো। সম্রাট হুমায়ূন নাকি ধরা পড়েছেন। তাঁকে এখানে আনা হচ্ছে। সম্ভবত হুমায়ূনকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগে হরিশংকর পালিয়ে গেলেন।

সম্রাট হুমায়ূনের ধরা পড়ার সংবাদ মিথ্যা। ধরা পড়েছে কামানচির এক সেনাপতি তোরাব জান।

জ্বলন্ত অগ্নিতে তোরাব জানকে নিক্ষেপ করা হলো।

ভগ্নহৃদয় হুমায়ূন আগ্রায় পৌঁছেছেন। ফরমান জারি করেছেন, তিনি মাগরেবের নামাজের আগে কারও সঙ্গেই দেখা করবেন না। সম্রাট রোজা রেখেছেন। সূর্যাস্তের পর রোজা ভেঙে নামাজ আদায় করবেন। তারপরই যদি তাঁর মন চায় তিনি পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। ঘনিষ্ঠজনদের একটি তালিকাও তিনি জওহর আবতাবচির কাছে দিয়েছেন। তালিকায় আছেন তাঁর মা, কামরান মীর্জার মা এবং বোন গুলবদন।

সম্রাট বিছানায় শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। তাঁর সামান্য শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ডানপায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন। সেই ব্যথা এখন প্রবল। পা ফুলে উঠেছে। তাঁর শোবার ঘরের দরজা আধখোলা। দরজার বাইরে রুপার ছোট ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা বেজে উঠল। সম্রাট বিরক্ত গলায় বললেন, আমি ফরমান জারি করেছি কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ করব না।

কোমল নারীকণ্ঠ দরজার বাইরে থেকে বলল, আমি সম্রাটের কাছে আসি নি। আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসেছি।

গুলবদন! কী চাও ?

আমি আমার ভাইকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদতে চাই।

এসো। ভেতরে এসো।

গুলবদন ছুটে এসে বিছানায় শোয়া হুমায়ূনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

হুমায়ূন বোনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিজেও কাঁদলেন। একটি শের আবৃত্তি করলেন। যার অর্থ, 'পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু হলো গভীর দুঃখ থেকে নিঃসৃত অশ্রুধারা।'

গুলবদন বললেন, আমি সম্রাটের জন্যে দু'টি আনন্দসংবাদ নিয়ে এসেছি। সম্রাট অনুমতি দিলে সংবাদ দুটি তাঁকে দেব।

হুমায়ূন বললেন, আমার বোন গুলবদন সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই যা ইচ্ছা বলতে পারে। সে সম্রাটের অনুমতির উর্ধ্বে।

প্রথম সুসংবাদ। আপনার বিদ্রোহী ভাইদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। তারা আপনার ক্ষমার অপেক্ষায় আছে। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রবল দুঃসময়ে তারা একত্রিত হয়ে আপনার সঙ্গে শের শাহ্'র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। কামরান মীর্জা পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত। আপনার অনুমতি পেলে সে শের শাহ্'র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে।

সম্রাট বললেন, এই সংবাদে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্পাকের দরবারে শুকুরগোজার করছি। দ্বিতীয় সুসংবাদটি বলো।

আপনি কামরান মীর্জার কাছ থেকে জাদুবিদ্যার একটি বই অনেকদিন থেকে চাচ্ছিলেন। কামরান মীর্জা বইটি নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজে আপনার হাতে তুলে দেবেন।

সম্রাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, জাদুবিদ্যার অতি মূল্যবান একটি বই আমাকে শের শাহ্ দিয়েছিলেন। আফসোস সেই বইটা নাই। হারিয়ে ফেলেছি।

গুলবদন বললেন, সম্রাট শুধু বই কেন, অনেক কিছুই তো আপনি হারিয়ে ফেলেছেন।

ঠিক বলেছ। আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা আকিকা বেগম নাই। তাকে নিয়ে অদ্ভুত সব দুঃস্বপ্ন দেখি। পালিয়ে যাওয়ার আগে কেন যে মেয়েটাকে নিজের হাতে হত্যা করলাম না!

গুলবদন বললেন, যা কিছু ঘটে আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশেই ঘটে। এই ভেবে শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করুন।

সম্রাট বললেন, এই ভেবে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা আমি সবসময় করি। তাতে লাভ হয় নি। মন শান্ত হয় না। মনের উপর কর্তৃত্ব মানুষের নেই। 'মন' আল্লাহ্‌পাকের হাতে।

কথা শেষ করেই সম্রাট হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর আদরের কন্যাকে ডাকতে লাগলেন, মা আকিকা। আয় আমার কোলে আয় মা।

হতাশ এবং ক্লান্ত হুমায়ূন আগ্রায় ফিরে প্রবল জ্বরের মধ্যে পড়লেন। কোনো চিকিৎসাতেই জ্বরের উপশম হলো না। হুমায়ূনভগ্নি গুলবদন ভাইয়ের রোগমুক্তির জন্যে এক মাস রোজা মানত করলেন।

জ্বরের দশম দিনে সম্রাট বিছানায় উঠে বসলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি এখন সক্ষম। আগামীকাল থেকে দরবারে বসবেন।

হুমায়ূনের রোগমুক্তি উপলক্ষে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হলো। সম্রাটের ওজনের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্যমুদ্রা গরিব-দুঃখীদের বিতরণ করা হলো।

সম্রাট দরবারে বসেছেন। তাঁর ভাইরাও উপস্থিত। হুমায়ূন তিন ভাইয়ের জন্য উপহার ঘোষণা করলেন। প্রত্যেকেই একটি করে ঘোড়া, পোশাক, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেলেন। তিনজনকেই একটি করে নীলকান্তমণি দেওয়া হলো। দরবারে উপস্থিত আমীররা নীলকান্তমণির সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে 'মার্‌হাবা' 'মার্‌হাবা' ধ্বনি দিলেন। সম্রাট অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বললেন, আমার তিন ভাই আমার সর্বশক্তির উৎসস্বরূপ। তারা কিছু ভুল-ভ্রান্তি করেছে। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার

প্রধান সমস্যা হলো, মাঝে মাঝে ভুল-ভ্রান্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করা। আমি আমার প্রাণপ্রিয় ভাইদের সকল ভুল ক্ষমা করে দিলাম।

আমীররা আবারও বললেন, মার্‌হাবা! মার্‌হাবা! সম্রাট সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁর ভাইদের আলিঙ্গন করলেন। আবারও আনন্দ ধ্বনি—মার্‌হাবা! মার্‌হাবা!

এই দরবার আমজনতার জন্যে উন্মুক্ত না। হুমায়ূনের তিন ভাই ছাড়া আমীররা আছেন, সেনাপতিরা আছেন। পারস্য-সম্রাটের একজন দূত আছেন। রাজমহিষীরা আছেন চিকের আড়ালে। প্রথম দরবারে কী হয় তা তাঁদের দেখার ইচ্ছা। ভাইদের মিলনদৃশ্য দেখার নাটকীয়তা থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করতে চাচ্ছেন না।

দরবারের বাইরে প্রধান ফটকে এক নাটক শুরু হয়েছে। নগ্নপদের এক লোক দরবারে ঢুকতে চাচ্ছে। তার গায়ে সস্তা উড়ুনি। গরমের মধ্যেও উড়ুনির উপর একটা নোংরা চাদর। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখ রক্তবর্ণ। সে বলছে তার নাম নিজাম। সে ভিসতিওয়ালা। সম্রাটের জীবনরক্ষাকারী।

প্রধান প্রহরী বলল, তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এই মুহূর্তে বিদায় না হলে তোমাকে কারাগারে ঢোকানো হবে।

নিজাম ভিসতি বলল, সম্রাট আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন। আমাকে একবার সাক্ষাতের সুযোগ দিন।

সম্রাটের সাক্ষাৎ পেতে যে যোগ্যতা লাগে তা তোমার নেই। তোমার পোশাক মলিন। পা খালি। তুমি সম্রাটের জন্য কোনো উপহার আনো নি। প্রহরীদের পরিতোষক তো অনেক পরের ব্যাপার।

নিজাম ভিসতি বলল, সম্রাট আমার কাছে ওয়াদা করেছেন আমাকে একদিনের জন্য সিংহাসনে বসাবেন। সম্রাট তাঁর ওয়াদা রক্ষা করলেই আমি আপনাদের সবার পারিতোষিকের ব্যবস্থা করব।

প্রধান প্রহরী বলল, আমি আমার জীবনে অনেক হাস্যকর কথা শুনেছি, এমন শুনি নাই।

বিশ্বাস করুন, সম্রাট আমাকে দেখামাত্র চিনতে পারবেন। তিনি যদি চিনতে না পারেন তাহলে বাকি জীবন আমি অন্ধকূপে কাটাতে রাজি আছি।

ভিসতি নিজামের কথা সত্যি হলো। সম্রাট দেখামাত্র তাকে চিনলেন। হাসিমুখে বললেন, তুমি ভিসতি নিজাম না?

নিজাম কুর্নিশ করতে করতে বলল, জি আলামপনা। আপনার স্মৃতিশক্তি প্রশংসারও ঊর্ধ্বে।

আমি তোমাকে বলেছিলাম একদিনের জন্যে হলেও তোমাকে সিংহাসনে বসাব। আজ অর্ধেকবেলা পার হয়ে গেছে, তারপরেও তুমি চাইলে আজই সিংহাসনে বসতে পার। তুমি কি আজই সিংহাসনে বসতে চাও?

সম্রাটের অনুগ্রহ এবং মহানুভবতা সমুদ্রের পানির চেয়েও বেশি। আমি আজই সিংহাসনে বসতে চাই।

সম্রাটের তিন ভাই স্তম্ভিত। আমীররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। কী ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সম্রাট বললেন, এই ভিসতিওয়ালা তার মশকের সাহায্যে আমার জীবন রক্ষা করেছে। জীবনরক্ষার পুরস্কার হিসেবে সে আধাবেলার জন্য সিংহাসনে বসবে। আমীররা তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবেন। একজন সম্রাটের প্রাপ্য সম্মানের পুরোটাই ভিসতি নিজাম পাবেন। ভিসতি নিজাম ইচ্ছা করলে রাজকীয় ফরমানও জারি করতে পারবেন।

দরবার কিছুক্ষণের জন্য শব্দহীন হয়ে গেল। সামান্য ভিসতিওয়ালা দিল্লীর সম্রাট? এ কেমন কথা? সবার দৃষ্টি ভিসতি নিজামের দিকে। দরবারের শান-শওকত দেখে সে খুব যে বিচলিত তা মনে হচ্ছে না। তার দৃষ্টি সম্রাটের দিকে নিবদ্ধ।

কামরান মীর্জা সম্রাটের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিচুগলায় বললেন, আমি কি ভারতবর্ষের সম্রাটের সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি ?

হুমায়ূন বললেন, অবশ্যই পার। তবে ভারতবর্ষের সম্রাট এখন আমি না। সম্রাট হলেন ভিসতিওয়ালা নিজাম।

আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাচ্ছি।

বলো।

আমার কথায় কোনো অসৌজন্য প্রকাশ পেলে আগেই মার্জনা চাই। সম্রাট আমার কথায় আহত হলেও কথাগুলি আমাকে বলতে হবে।

বলো। তবে বারবার আমাকে সম্রাট বলে সম্বোধন করবে না। তোমাকে বলা হয়েছে সম্রাট এখন ভিসতি নিজাম।

ভিসতি নিজাম এখনো সিংহাসনে বসে নি। দরবারে দাঁড়িয়ে আছে। সে যখন সিংহাসন বসবে তখন তার প্রতি যোগ্য আচরণই আমি করব।

কী বলতে চাও বলো ?

আমার যা বলার তা আমি আলাদা করে শুধু আপনাকেই বলতে চাই। সবার সামনে বলতে চাই না।

হুমায়ূন বললেন, পবিত্র কোরান শরীফে একটি আয়াত আছে, সেখানে আল্লাহ্‌পাক বলছেন, তোমরা দুজন যখন কথা বলো তখন তৃতীয়জন হিসেবে আমি সেখানে উপস্থিত থাকি।

কামরান মীর্জা বললেন, অনেক কথা আছে যা আল্লাহ্‌পাক শুনলে ক্ষতি নেই, অন্য কেউ শুনলে ক্ষতি আছে।

হুমায়ূন কিছুক্ষণের জন্যে দরবার থেকে বিদায় নিয়ে চিকের পর্দার আড়ালে গেলেন। সেখানে রাজমহিষীদের অনেকেই ছিলেন। তাঁরা

কৌতূহলী চোখে ভিসতি নিজামকে দেখছেন এবং তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছেন। সম্রাটকে আসতে দেখে সবাই সরে গেলেন, শুধু গুলবদন থেকে গেলেন। তিনি হুমায়ূনের দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললেন, আপনাদের আলোচনায় আমি কি থাকতে পারি ?

সম্রাট কিছু বলার আগেই কামরান মীর্জা বললেন, আমার বোন থাকতে পারে। আমি কী বলছি তার একজন সাক্ষী থাকারও প্রয়োজন। হুমায়ূন হাতের ইশারা করলেন। এই ইশারার অর্থ গুলবদন থাকতে পারে।

কামরান মীর্জা বললেন, এক সামান্য ভিসতিওয়ালাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসানোর কিছু নেই। তাকে ধনরত্ন দেওয়া যেতে পারে, জায়গির দেওয়া যেতে পারে। সিংহাসনে কেন বসানো হবে ?

হুমায়ূন বললেন, আমি কথা দিয়েছি এইজন্যে বসানো হবে।

আপনি ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে কথা দিয়েছিলেন। তখন আপনার মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। আপনি ছিলেন প্রবল ঘোরের মধ্যে। আমরা দুঃসময়ে অনেক কথা বলি, সবই অর্থহীন কথা।

আমার কাছে অর্থহীন কথাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

কামরান মীর্জা বললেন, মোগল সাম্রাজ্য বিরাট বিপদের মুখে। এখন আপনার উচিত শের শাহ্ নামের দস্যুকে কীভাবে শায়েস্তা করবেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। একজন মিসকিনকে সিংহাসনে বসানোর ছেলেখেলার সময় এটা না।

আধাবেলার ব্যাপার।

এক পলকের ব্যাপারও হতে পারে না। দিল্লীর সিংহাসন দড়ির চারপাই না। যাকে তাকে সেখানে বসানো যায় না।

তোমার কথা কি শেষ হয়েছে ?

হ্যাঁ।

আমার নির্দেশ—তুমি দরবারে যাবে এবং নতুন সম্রাটকে কুর্নিশ করে সম্মান প্রদর্শন করবে।

আপনার নির্দেশ পালন করা আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি অপারগ। কারণ আমি অসুস্থ বোধ করছি। শারীরিক এবং মানসিক দুইভাবেই অসুস্থ।

তুমি দরবারে যাবে না ?

না। এবং আমি আশা করব আপনিও যাবেন না। নতুন সম্রাট সিংহাসনে বসবেন আর আপনি অন্যসব দরবারির মতো তাকে সম্মান দেখাবেন তা হতে পারে না। নিজেকে হাসি-তামাশার বিষয়ে পরিণত করবেন না।

গুলবদন বললেন, কামরান মীর্জার কথা যুক্তিপূর্ণ।

হুমায়ূন বললেন, যুক্তিই সবকিছু না। যুক্তির উপরে অবস্থান করে হৃদয়।

কামরান মীর্জা তিক্ত গলায় বললেন, এই বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনার শের মুখস্থ আছে। শেরটা বলুন শুনি।

হুমায়ূন শের আবৃত্তি করলেন। শেরটির ভাবার্থ এ রকম—

> হে প্রিয়তমা!
> যুক্তি বলছে তোমাকে পাওয়া আকাশের চন্দ্রকে হাতে পাওয়ার মতোই দুঃসাধ্য। মন বলছে তোমাকে পেয়েছি। মনের কথাই সত্য। তুমি আমার।

ভিসতি নিজাম গম্ভীর মুখে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর চেহারা মলিন, পোশাক মলিন। তবে রাজমুকুট এবং পাদুকা ঝকঝক করছে। পাদুকা সরবরাহ করা হয়েছে। রাজমুকুট স্বয়ং হুমায়ূন নিজামের মাথায় পরিয়েছেন। পাদুকা তিনি পায়ে পরেন নি, কারণ তাঁর পা অনেক বড়। মাপে হয় নি। পাদুকার উপর পা রেখে তিনি বসেছেন।

প্রধান নকিব ঘোষণা করল, আল সুলতান আল আজম ওয়াল খাকাল আল মুকররাম, জামিই সুলতানই হাকিকি ওয়া মাজাজি ভিসতি নিজাম পাদশাহ্।

আমীররা কুর্নিশ করলেন।

নতুন সম্রাট পাশে দাঁড়ানো আমীরকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিচুগলায় জানতে চাইলেন, দুপুরের খাবার কখন দেওয়া হবে ? তাঁকে সময় বলা হলো। তিনি বললেন, দিল্লীতে তাঁর দূরসম্পর্কের এক দেশিয়াল ভাই আছেন। দুপুরের খানায় তাকে কি আমন্ত্রণ জানানো যাবে ?

অবশ্যই যাবে। তাকে আনতে এক্ষুনি হাতি পাঠানো হবে।

খাওয়ার পর আমার দেশিয়াল ভাইকে নিয়ে আমি কি মোগল হেরেম পরিদর্শনে যেতে পারি ?

আপনি যখন ইচ্ছা তখন যেতে পারবেন, তবে আপনার ভাই যেতে পারবেন না। সম্রাট ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

আমি যদি ফরমান জারি করি ?

আপনি ফরমান জারি করলেও হবে না। সম্রাটকেও নিয়মকানুনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

আমার ভাইয়ের খুব শখ ছিল হেরেম পরিদর্শন করা। কোনো উপায় কি আছে ?

একটা উপায় আছে। আপনার ভাইকে খোজা করানো হলে উনি যেতে পারবেন। সেই ব্যবস্থা কি করব ?

নতুন সম্রাট গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলায় নতুন সম্রাটের সময় শেষ হলো। তিনি প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে নিজ গ্রামের দিকে রওনা হলেন। তিনি নিজে ঘোড়ায় করে

যাচ্ছেন, তাঁর পেছনে পেছনে দুটা গাধা। গাধার পিঠে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা। তাঁকে নিরাপদে বাড়িতে পৌছে দেওয়ার জন্যে দশজন অশ্বারোহীর একটি দল আগে আগে যাচ্ছে।

দিল্লীর উপকণ্ঠে ভিসতি নিজামের উপর ডাকাত দল ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা অনেকক্ষণ ধরেই নিজামকে অনুসরণ করছিল। ডাকাতের ছদ্মবেশে এরা সবাই কামরান মীর্জার দেহরক্ষী বাহিনী। নিজামকে রক্ষাকারী দলের সবাই ঘটনা বুঝতে পেরে দ্রুত পালিয়ে গেল। ডাকাত দল ধনরত্ন এবং ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। আধাবেলার দিল্লীশ্বরের মৃতদেহ নর্দমায় পড়ে রইল। তার উপর নীল রঙের স্বাস্থ্যবান মাছি ভনভন করতে লাগল। দুটি গাধার একটি প্রভুর মৃতদেহের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে রইল। *

---

* গুলবদনের লেখা *হুমায়ূননামায়* বলা হয়েছে, নিজাম ভিসতি দুই দিনের জন্যে দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন। অন্য কোনো সূত্র তা সমর্থন করে না। নিজাম ভিসতি অর্ধদিবসের সম্রাট—এই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত।

দিল্লীর পথেঘাটে জনৈক নগ্নপদ বৃদ্ধকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। তার চক্ষু কোটরাগত। অনাহারে-অর্ধাহারে শরীর ভেঙে গেছে। সে কপর্দকহীন। তার বেশির ভাগ সময় কাটে হালুইকারির দোকানের আশপাশে। দোকানিদের কেউ কেউ একটা লাড্ডু, একটা লুচি ছুঁড়ে দেয়। বৃদ্ধ তা লুফে নেয়। খাবারের সন্ধানে সে শ্মশানঘাটেও বসে থাকে। সেখানে গুড় মাখানো চিঁড়া বিতরণ করা হয়। বৃদ্ধ উড়নি পেতে চিঁড়া গ্রহণ করে। বৃদ্ধ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। কিন্তু সে পৈতা লুকিয়ে ফেলেছে। ব্রাহ্মণরা উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। বৃদ্ধ নিরুপায়। উচ্ছিষ্ট খাদ্যগ্রহণে তার কোনো আপত্তি নাই। দিল্লী শহরের অন্য ভিক্ষুকদের সঙ্গে তার এখন কোনো তফাত নেই। খাদ্য নিয়ে ভিক্ষুকদের সঙ্গে সে কাড়াকাড়িও করে।

ভিক্ষুকো ভিক্ষুকং দৃষ্টা
শ্বতুল্যং গুরগুরায়তে

(কুকুর যেমন অন্য কুকুরকে দেখলে গর্জন করে, ভিক্ষুকও সেরকম অন্য ভিক্ষুককে দেখলে গর্জন করতে থাকে।)

এই বৃদ্ধ আমাদের পরিচিত। তাঁর নাম হরিশংকর। আচার্য হরিশংকর। তিনি শত মাইল হেঁটে দিল্লী এসেছেন সম্রাট হুমায়ূনের সাক্ষাৎপ্রত্যাশী হয়ে।

সম্রাট তাঁর অতীত জানেন না। কাজেই সম্রাটের কৃপা প্রার্থনা তিনি করতে পারেন। সম্রাট সন্দেহ্ করবেন না। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নি। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভিক্ষুককে রাজদরবারে ঢোকানো যায় না। সম্রাটের দর্শনপ্রার্থীদের উপহার নিয়ে যেতে হয়। আচার্য হরিশংকরের কাছে তার নোংরা উড়ুনি ছাড়া কিছু নেই।

প্রতি শুক্রবার হাতির পিঠে চড়ে সম্রাট জুমার নামাজ পড়তে যান। এই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হরিশংকর সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নানান অঙ্গভঙ্গি করেন, উচ্চস্বরে কাঁদেন। তাতে লাভ হয় না। সম্রাট তাকান না।

এখন হরিশংকর লাফ দিয়ে হাতির সামনে পড়ার চিন্তাভাবনা করছেন। সাহস সঞ্চয় করতে পারছেন না।

এক জুমাবারে হরিশংকর রাস্তার পাশ থেকে দৌড়ে এসে সম্রাটের হাতির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হওয়ার দৃশ্য না দেখাই ভালো।

চারদিক থেকেই হৈচৈ হচ্ছে। ঘণ্টা বাজছে। ভীত হরিশংকর চোখ খুললেন।

আশ্চর্য! হাতির পিঠের হাওদায় বসা সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কি তাকে চিনতে পারছেন? উত্তেজনায় হরিশংকর কুর্নিশ করতে ভুলে গেল।

সম্রাট বললেন, আপনি কি আচার্য হরিশংকর?

হরিশংকর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে উঠে হাতজোড় করে বললেন, সম্রাট আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমার জীবন ধন্য। আমি শের শাহ্'র হাতে বন্দি ছিলাম। কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছি। আমি সম্রাটের দেখা পেয়েছি, আমার জীবন ধন্য।

আমার দেখা পাওয়ার জন্যেই কি আপনি এসেছেন ?

হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে হরিশংকর আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সম্রাট বললেন, আপনার অতি মলিন বেশ, ভগ্ন শরীর দেখে আমি ব্যথিত। কাল রাজদরবারে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

সম্রাট হুমায়ূন হরিশংকরকে সভাসদের পদ দিলেন। তিনি সম্রাটের উপদেষ্টাদের একজন হলেন। সম্রাট হুমায়ূনের অনেক বড় বড় ভুলের মধ্যে এটিও একটি।

সাত দিনের মধ্যে আচার্যের চেহারায় জেল্লা ফিরে এল। নতুন পোশাকে তাঁকে দরবারে মোটেই বেমানান মনে হলো না। তিনি অবশ্যি নিজেকে সবকিছু থেকে আলাদা করে মৌনী ভাব ধরলেন। যদিও তিনি জানেন—

বিদ্যা স্তব্ধস্য নিষ্ফলা

(যে কথা কইতে ভয় পায়, তার বিদ্যা নিষ্ফল হয়।)

আচার্য হরিশংকর অপেক্ষায় আছেন। কথা বলার সময় অনেক পাওয়া যাবে। কিছু কথা সম্রাটকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চান। কী বলবেন তা ভেবে রেখেছেন। সম্রাটের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ হচ্ছে না।

যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে সম্রাট ব্যস্ত। মিত্র রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে সম্রাটের চিঠি নিয়ে রাজদূতরা যাচ্ছেন। তিনি নিজের ভাইদের সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক করছেন। মীর্জা কামরান পবিত্র কোরান শরীফে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে সম্রাটের ডানহাত হয়ে কাজ করবেন।

মীর্জা কামরানকে নিয়ে সম্রাটের সামান্য আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

রাজজ্যোতিষীদের শুভক্ষণ বের করতে বলা হয়েছে। সম্রাট নিজে ইস্তেখারা নামাজ পড়েছেন। ইস্তেখারার নামাজের পর অজু করে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে নির্দেশ আসে। স্বপ্নে যা দেখা যায় তার সবটাই প্রতীকী। এই প্রতীকের অর্থ-উদ্ধার বেশিরভাগ সময় কঠিন হয়।

সম্রাট স্বপ্নে দেখেছেন ধবধবে সাদা একটা বক গাছে বসেছে। গাছের পাতা খাচ্ছে।

স্বপ্নের তফসিরকারীরা স্বপ্নের অর্থ করেছেন এইভাবে—

> বক মাংসাশী। সে জীবন্ত মাছ, পোকামাকড় ধরে ধরে খায়। স্বপ্নে সে তার স্বভাব পরিবর্তন করে তৃণভোজী হয়ে গাছের পাতা খাচ্ছে। প্রতীকীভাবে বক হলো শের শাহ্। কারণ সে পাখির মতোই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বক যেমন ধবল সাদা, শের শাহ্'র মাথার পাগড়িও ধবল সাদা। স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ অর্থ—বক তার স্বভাব পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ শের শাহ্ স্বভাব পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন হবে যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে।

রাজদরবারের সবাই স্বপ্নের তফসিরে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। শুধু আচার্য হরিশংকর মৌন রইলেন।

সম্রাট বললেন, আচার্য হরিশংকর, আপনি চুপ করে আছেন কেন? স্বপ্নের এই ব্যাখ্যার বিষয়ে আপনার কি কিছু বলার আছে?

আচার্য হরিশংকর বললেন, আমার বলার আছে। তবে আমি মৌন থাকতে চাচ্ছি। জ্ঞানীদের সামনে কথা বলার অর্থ নিজের মূর্খতা ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা।

হুমায়ূন বললেন, আপনার বক্তব্য আমি শুনতে চাচ্ছি।

হরিশংকর বললেন, আমি মনে করি এই বক সম্রাট নিজে। সম্রাটের অন্তর অতি পবিত্র। পবিত্রতার রঙ সাদা। বকও সাদা। বক মাছ না খেয়ে পাতা খাচ্ছে, কারণ সে কৌশল পরিবর্তন করেছে। স্বপ্নের মাধ্যমে সম্রাটকে যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করতে বলা হচ্ছে।

হুমায়ূন বললেন, আপনার ব্যাখ্যা আমি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলাম। যুদ্ধযাত্রায় আপনি আমার সঙ্গী হবেন।

হরিশংকর বললেন, সম্রাট যে আদেশ করবেন তা-ই হবে। তবে আমার উপস্থিতি আপনার জন্যে অমঙ্গলস্বরূপ। আমাকে রাজধানীতে রেখে যাওয়াই আপনার জন্যে শুভ হবে।

শুভদিন দেখে হুমায়ূন শের শাহ্‌কে লণ্ডভণ্ড করে দিতে যুদ্ধযাত্রা করলেন। শেষ মুহূর্তে মীর্জা কামরান সরে দাঁড়ালেন। কারণ নদীর এক মাছ খেয়ে তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিছানা থেকে উঠে বসার ক্ষমতাও নেই। এই অবস্থায় যুদ্ধযাত্রা করা যায় না। তবে তিনি পাঁচ শ' ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দিলেন। তারা কিছুদূর গিয়ে পাঞ্জাবে ফিরে এল। সম্ভবত এরকম নির্দেশই তাদের উপর ছিল।

হুমায়ূন ভাইকে একটি চিঠি পাঠিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। চিঠিতে লেখা—

ভাই কামরান,

তোমার অসুখের খবর শুনে ব্যথিত বোধ করছি। আমার ব্যথা আরও প্রবল হয়েছে, কারণ শের শাহ্ নামক দস্যুর পরাজয় তুমি নিজের চোখে দেখতে পেলে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কল্পনা করে নেব তুমি আমার পাশেই আছ। কল্পনার শক্তি বাস্তবের চেয়ে কম না।

আমার প্রধান ভরসা কল্পনার তুমি এবং তোপখানার দুই প্রধান উস্তাদ আহমাদ রুমী ও হোসেন খলিফা। শুধু এই দুজনই কামান দেগে শের শাহ্‌'র বাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে।

আমি তোমার আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। আশা করছি তুমি তোমার বিজয়ী ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তোরণ নির্মাণ করে অপেক্ষা করবে।

যদি দ্রুত আরোগ্য লাভ করো, তাহলে বড়ভাইকে সাহায্য করার জন্যে কনৌজে চলে আসবে।

তোমার বড়ভাই
হুমায়ূন মীর্জা

সম্রাট এই চিঠি সম্রাট হিসেবে লিখলেন না। ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের চিঠি গেল। সম্রাটের সীলমোহর চিঠিতে পড়ল না।

কামরান মীর্জা অসুস্থের ভান করলেন। বড় বড় হেকিমরা তার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। হেকিমরা ঘোষণা করলেন, কামরান মীর্জাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। এই জঘন্য কাজ কে করেছে তা জানার চেষ্টা শুরু হলো। সন্দেহ অন্তঃপুরের দিকে। রাজপরিবারের নারীরা আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগলেন।

এবারের যুদ্ধে হুমায়ূন কোনো রাজপরিবারের মহিলা সদস্যকে নিয়ে যান নি। কামরানের আদেশে তাদের সবাইকে গৃহবন্দি করা হলো।

কামরান মীর্জা বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমীরদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করতে লাগলেন। সব আমীরকে একসঙ্গে ডেকে বৈঠক না, আলাদা

আলাদা বৈঠক। এক বৈঠকে আচার্য হরিশংকরের ডাক পড়ল। তিনি দিল্লী থেকে লাহোরে এসেছেন অসুস্থ মীর্জা কামরানের শারীরিক কুশল জানার জন্যে।

মীর্জা কামরান বললেন, শুনেছি আমার বড়ভাই আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং জ্ঞানের একজন সমজদার।

হরিশংকর বললেন, সম্রাট হাতি, আমি সামান্য মূষিক।

যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি মারা পড়ে। মূষিকের কিছু হয় না।

হরিশংকর বললেন, হাতির মৃত্যুতে যায় আসে, মূষিকের মৃত্যুতে কিছু যায় আসে না বলেই মূষিকের কিছু হয় না।

আপনার কী ধারণা ? সম্রাট শের শাহ্‌কে পরাজিত করতে পারবেন ?

আমি কি নির্ভয়ে আমার মতামত জানাব ?

অবশ্যই।

সম্রাট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবেন।

কারণ ?

প্রধান কারণ আপনি। আপনি না থাকায় তার মনোবল ভেঙে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মনোবলের বিরাট ভূমিকা আছে।

মীর্জা কামরান বললেন, আচার্য হরিশংকর! সম্রাট বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তাঁর আছে বিশাল গোলন্দাজ বাহিনী।

শের শাহ্‌'র কূটবুদ্ধির কাছে বিশাল গোলন্দাজ বাহিনী দাঁড়াতেই পারবে না, হুমায়ূন পরাজিত এবং নিহত হবেন।

নিহত হবেন ?

প্রথমবার ভাগ্যগুণে প্রাণে বেঁচে গেছেন। ভাগ্য বারবার সাহায্য করে না।

সম্রাট পরাজিত হলে দিল্লীর সিংহাসনের কী হবে ?

নির্ভর করছে আপনার কর্মকাণ্ডের উপর। আপনি যদি অসুস্থতার ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকেন, তাহলে দিল্লীর সিংহাসন চলে যাবে শের শাহ্‌'র হাতে। আর আপনি যদি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন, সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন তাহলে দিল্লীর সিংহাসন আপনার।

আপনি কি আমার উজিরদের একজন হতে রাজি আছেন ?

না।

না কেন ?

যতদিন সম্রাট জীবিত ততদিনই আমি সম্রাটের অনুগত নফর। কোনো কারণে সম্রাটের প্রাণহানি হলে আমি আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করব। তার আগে না।

আছরের নামাজের পরপর মীর্জা কামরান বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্‌পাকের অসীম করুণায় তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন। তিনি রোগমুক্তি-স্নান করে মাগরেবের নামাজ আদায় করার প্রস্তুতি নিলেন। রোগমুক্তি উপলক্ষে রাজমহিষীরা সবাই উপহার পেলেন। যাঁরা গৃহবন্দি ছিলেন, তাঁদের বন্দিদশা দূর হলো। সর্ব সাধারণের কাছে গেল তিন হাজার রৌপ্য মুদ্রা। আমীররা খেলাত পেলেন। আচার্য হরিশংকরকে দেওয়া হলো রত্নখচিত ভোজালি।

কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ূনের শোচনীয় পরাজয় হলো। চৌসার যুদ্ধে তিনি যেসব ভুল করেছিলেন এই যুদ্ধেও সেইসব ভুল করলেন। কামানচির দল কামানের একটি গোলাও ছুঁড়তে পারল না।

হুমায়ূনের ছত্রভঙ্গ বাহিনীর একটা বড় অংশ গঙ্গার পানিতে ডুবে মরল। যারা বেঁচে রইল তাদের তাড়া করল শের শাহ্'র বড় পুত্র জালাল খাঁ।

চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূন গঙ্গার পানিতে পড়েছিলেন। এবারও তাই হলো। তিনি হাতি নিয়ে গঙ্গায় পড়লেন। হাতি তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। শের শাহ্'র তীরন্দাজ বাহিনী ধনুক উঁচিয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই তীর ছুঁড়ে তারা সম্রাটকে মারতে পারে। তারা এই কাজটি করছে না। কারণ শের শাহ্'র কঠিন নির্দেশ—হুমায়ূনকে হত্যা বা আহত করা যাবে না। তাঁকে বন্দি করাও যাবে না। তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

জালাল খাঁ পরাজিত সৈন্যদের ধাওয়া করে দিল্লী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। পনেরই জুলাই ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ্ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে বসলেন।

ওই দিন প্রবল বর্ষণ হলো। দীর্ঘদিন দাবদাহে অতিষ্ঠ দিল্লীবাসীদের আনন্দের সীমা রইল না। তারা বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে পথে নেমে পড়ল। তারা লক্ষ্য করল, অতি সাধারণ চেহারার এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে

দিল্লীর পথে নেমে বৃষ্টিতে ভিজছে। এই ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নিয়েছে জনতার কেউ তা বুঝতে পারল না।

হুমায়ূন লাহোর থেকে শের শাহ্‌কে একটি কবিতা লিখে পাঠালেন। কবিতাটি হলো—

দর আইনা গরচে খুদ নুমাই বাশদ
পৈবস্তা জ খেশতান জুদাই বাশদ।
খুদ রা ব মিশলে গোর দীদন অজব অস্ত;
ঈ বুল অজবো কারে খুদাই বাশদ।*

[যদিও আয়নায় নিজ চেহারা দেখা যায় তারপরেও তা আলাদা থাকে। নিজেকে অন্যরূপে দেখা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। এ হলো আল্লাহর অলৌকিক কাজ।]

শের শাহ্‌ চিঠির জবাবে লিখলেন, আমি মূর্খ বিশেষ। আপনার কবিতার অর্থ বোঝা আমার জ্ঞানের অতীত। আমি লাহোর দখল করতে রওনা হব। আপনার জন্যে লাহোর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মঙ্গল হবে।

---

*গুলবদন, *হুমায়ূননামা*।

মীর্জা হিন্দালের মা দিলদার বেগমের দিনলিপি। শ্রুতিলিখন করেছে তার এক দাসী হোসনা জান।

> "আমার রাতের ঘুম এবং এবাদত হারাম হয়ে গেছে। আমি চোখের পাতা বন্ধ করলেই দস্যু শের শাহ্‌কে স্বপ্নে দেখি। এই দস্যু তার পঙ্গপাল বাহিনী নিয়ে ছুটে আসছে। তার একমাত্র ইচ্ছা মোগল বংশকে সমূলে ধ্বংস করা। হুমায়ূন তাঁর হাতে ধরা পড়লে না জানি কী পরিণতি হবে। মনে হয় সে আমার অতি আদরের হুমায়ূনকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবে। শুনেছি দস্যুটা মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে পছন্দ করে। আল্লাহ্‌পাকের কাছে আমার প্রার্থনা—যেন কোনো ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে দস্যু তার দলবল নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।"

দিনলিপিতে যে অস্থিরতা দিলদার বেগম দেখালেন তার চেয়ে অনেক বেশি অস্থির সম্রাট হুমায়ূন। তিনি তাঁর দিনলিপি লেখা বন্ধ রেখেছেন। সৈন্য সংগ্রহের মতো অর্থের জোগাড় করতে পারছেন না। প্রতিটি মিত্র রাজার কাছে চড়া সুদে অর্থ চেয়ে পত্র লিখেছেন। কেউ পত্রের জবাব দেওয়ার সৌজন্যও দেখাচ্ছে না। তারা এখন এমন কিছুই করবে না যাতে দিল্লীর অধীশ্বর শের শাহ্ বিরক্ত হন।

হুমায়ূনের ব্যক্তিগত ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটি অংশ কামরান মীর্জার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কামরান মীর্জা তাতে আপত্তি করে নি কেন ? সে কি হুমায়ূনকে ত্যাগ করে শের শাহ্'র সঙ্গে যুক্ত হবে ? এও কি সম্ভব ?

কামরান মীর্জা আমীরদের নিয়ে ঘনঘন দরবার করছে। এর কোনোটাতেই হুমায়ূনকে ডাকা হচ্ছে না।

সম্রাটের কাছে খবর আছে, গভীর রাতে কামরানের এক আমীর ফতে খাঁ লাহোর ত্যাগ করেছে। তার সঙ্গে বারোজন সৈন্যের একটা দল আছে। এই আমীর কি কামরানের গোপন কোনো চিঠি নিয়ে শের শাহ্'র কাছে গেছে ?

হুমায়ূন সব ভাইদের এক করার জন্যে একটি আলোচনা-সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় তাঁর সব ভাইরা উপস্থিত থাকলেও কামরান আসে নি।

বড় অস্থির সেই সময়ে দিলদার বেগম হুমায়ূনকে গোপন এক পত্র পাঠালেন। সেখানে লেখা—

পুত্রসম হুমায়ূন
সম্রাট

বাদশাহ নামদার।

তুমি নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছ বলে শুনেছি। এই মুহূর্তে তোমার অর্থের অবশ্যই প্রয়োজন। আমার কাছে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং দুই লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা গোপনে রাখা আছে। তুমি আমার কাছ থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করে কাজে লাগাও। তোমার চন্দ্রের মতো মুখমণ্ডল অনেকদিন দেখি না।

ইতি
দিলদার বেগম

হুমায়ূন দিলদার বেগমের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হুমায়ূনের সঙ্গে তাঁর চার পত্নী। পত্নীরা হলেন—

বেগা বেগম

মাহ্ চুচক বেগম

গুনবার বেগম

মেওয়াজান

হুমায়ূন পত্নীদের সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যেতেন না। চৌসার যুদ্ধেও তাঁর পত্নীরা সঙ্গী ছিলেন। চৌসার যুদ্ধে তাঁর দুই পত্নী চাঁদ বিবি এবং সাদ বিবি পানিতে ডুবে মারা যান। বেগা বেগম শের শাহ্'র হাতে ধরা পড়েন। শের শাহ্'র মহানুভবতায় তিনি স্বামীর কাছে ফিরতে পারেন।

হুমায়ূনের সর্বশেষ পত্নী মেওয়াজান ছিলেন হুমায়ূনভগ্নি গুলবদনের দাসী। হুমায়ূন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে মেওয়াজানকে বিয়ে করেন এবং বিয়ের রাতে আমীরদের বলেন, বেহেশতের হুর এই মেয়ের চেয়ে রূপবতী হবে আমি তা বিশ্বাস করি না।

সম্রাট তার বিমাতার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করলেন। আনন্দে তাঁর চোখ ভিজে উঠল। দিলদারের নির্দেশে রাজপরিবারের মহিলারা একে একে সম্রাটকে কুর্নিশ করতে এলেন। চৌদ্দ বছর বয়সী এক মেয়েকে দেখে সম্রাট চমকে উঠলেন।

সম্রাট বললেন, তোমার নাম কী ?

হামিদা বানু।

তুমি কি রাজপরিবারের কেউ ?

না। আমি সামান্য একজন। আমার পিতার নাম মীর আবুল বকা। তিনি একজন শিক্ষক। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা হিন্দাল আমার পিতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

তুমিও কি তোমার পিতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছ ?

জি জাহাঁপনা।

তুমি খুব সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছ। একজন সম্রাটের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাও নি।

আপনি এখন সম্রাট না। পরাজিত এক নৃপতি। নির্বাসিত।

আচ্ছা তুমি যাও।

হামিদা বানু ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র হুমায়ূন দিলদার বেগমকে বললেন, আমি এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

দিলদার বেগম অবাক হয়ে বললেন, এ নিতান্তই বালিকা। এবং মুখরা।

হুমায়ূন বললেন, হোক বালিকা, হোক মুখরা।

মেয়েটি শিয়া সম্প্রদায়ের। তুমি সুন্নি।

হুমায়ূন বললেন, শিয়া সুন্নির মতের এবং প্রার্থনার কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু তাদের বিয়েতে কোনো বাধা নেই। আপনার কাছে অনুরোধ, আজ রাতেই আপনি তার কাছে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে যাবেন।

বাবা, তুমি বিষয়টা নিয়ে আরেকটু চিন্তা করো।

চিন্তা যা করার করেছি। আর চিন্তা করব না।

হতভম্ব দিলদার বেগম নিজেই সম্রাটের ইচ্ছার কথা হামিদা বানুকে জানালেন। হামিদা বানু বলল, আমি এমন একজনকে বিয়ে করব যার হাত আমি যে-কোনো সময় ধরতে পারব। যাকে তিনবেলা কুর্নিশ করতে হয় তাকে আমি বিয়ে করব না। কোনো অবস্থাতেই না। সম্রাটের চার স্ত্রী জীবিত। তিনি আরও বিবাহ করবেন। আমি এমন একজনকে বিবাহ করব যার বিয়ে-রোগ নেই। আমিই হব তার একমাত্র স্ত্রী।

তোমার কতবড় সৌভাগ্য সেটা একটু চিন্তা করো।

পরাজিত সম্রাটের সঙ্গে বিবাহ্ হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। সম্রাটের মন্দ ভাগ্যের সঙ্গে আমি আমার ভাগ্য জড়াতে চাই না।

তুমি নিতান্তই বালিকার মতো তর্ক করছ।

হামিদা বানু হাসতে হাসতে বলল, আমি তো বালিকাই।

সারা রাত চেষ্টা করেও হামিদা বানুকে রাজি করানো গেল না।

মীর্জা হিন্দাল ঘটনা শুনে ভাইয়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ করলেন। যাকে শের শাহ্ তাড়া করছে, যার পালানোর পথ প্রায় বন্ধ, সে কী করে এইসময় বিয়ের জন্যে পাগল হবে ?

দিলদার বেগম হুমায়ূনের সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন। হুমায়ূন ঘোষণা করলেন, হামিদা বানুর সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো খাদ্য গ্রহণ করবেন না। উপবাস থাকবেন।

সম্রাট কোনো খাদ্য গ্রহণ করছেন না শুনে হামিদা বানু বিয়েতে রাজি হলেন।

দিলদার বেগমের কাছ থেকে পাওয়া দুই লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা সম্রাট বিবাহের 'নিকাহানা' হিসেবে হামিদা বানুর বাবা মীর আবুল বকাকে দিলেন। এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলেন নবপরিণীতা স্ত্রীকে।

বাসর রাতে হামিদা বলল, আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়েছি। তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, যত বড় বিপদই আপনার ওপর আসুক আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না।

সম্রাট বললেন, তোমাকে নিয়ে আমি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছি। কবিতাটা শুনবে ?

হামিদা বললেন, না। আমি এখন ঘুমাব। আমার ঘুম পাচ্ছে।

সম্রাট বললেন, আমি হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত তুমি ঘুমাতে পারবে না। আমি হুকুম দিই নাই।

হামিদা বানু চোখ বন্ধ করলেন এবং পাশ ফিরলেন।

সম্রাট বললেন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ ?

না।

তোমাকে আমি একটা উপহার দেব। উঠে বসো। উপহারটা কী দেখো।

কী উপহার ?

একটা হীরা। এর নাম কোহিনুর।

কোহিনুরের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি কপর্দকহীন একজন মানুষ। এই হীরা আপনার প্রয়োজন।

কোহিনুর তুমি নেবে না ?

না। এখন অনুমতি দিন, আমি ঘুমাব।

যাও অনুমতি দিলাম।

সম্রাট ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।

আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্র হামিদা বানু বললেন, আপনি দুর্বল সম্রাট কিন্তু অত্যন্ত সবল একজন কবি। কবিকে অভিনন্দন।

হামিদা বানুর গর্ভেই পৃথিবীর সেরা নৃপতিদের একজন জন্মান। তিনি সম্রাট আকবর। আকবর দ্য গ্রেট।

এই প্রসঙ্গ যথাসময়ে আসবে।

ফজরের নামাজ শেষ করে সম্রাট হুমায়ূন কিছুক্ষণ ঘুমান। দিনের কাজকর্ম শুরু হয় ঘুম থেকে ওঠার পর।

আজ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। সম্রাট নামাজ শেষ করে বাগানে গেছেন। তাঁর মন প্রফুল্ল। গত রাতের শেষ অংশে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছেন। শেষরাতের স্বপ্ন অর্থবহ। একজন তফসিরকারীকে দিয়ে স্বপ্নের অর্থ করাতে হবে।

স্বপ্নে তিনি তাঁর পিতা বাবরকে দেখেছেন। পাদশাহ বাবর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। পেছনে পেছনে যাচ্ছেন হুমায়ূন। জায়গাটা মনে হলো কাশ্মীরের কোনো বাগান। কাশ্মীর পাদশাহ বাবরের অতি প্রিয় স্থান। কাশ্মীরকে তিনি বলতেন, আমার ব্যক্তিগত বাগিচা।

ঘোড়ায় যেতে যেতে একটা জলা জায়গার কাছে বাবর থামলেন। ঘোড়া থেকে নামলেন না। হুমায়ূনকে বললেন, তাকিয়ে দেখো কী সুন্দর জলপদ্ম! যাও এই পদ্মটি তুলে আনো। আমি এত সুন্দর জলপদ্ম কখনো দেখি নি।

পিতার আদেশ শুনে হুমায়ূন ঘোড়া থেকে নামলেন। পদ্ম আনতে তাঁকে পানিতে পা ফেলতে হলো। পানি বরফশীতল। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ।

স্বপ্নের এই পর্যায়ে সম্রাটের ঘুম ভাঙল। অনেকদিন তিনি পিতাকে স্বপ্নে দেখেন না। তাঁর চেহারাও হুমায়ূনের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল।

স্বপ্নে পিতাকে অতি স্পষ্ট দেখে হুমায়ূনের মন আনন্দে পূর্ণ হয়েছে। তিনি নিশ্চিত এটি একটি ভালো স্বপ্ন।

লাহোরের এই বাগানে জলপুষ্প ফোটার জন্যে একটি জলাধার করা হয়েছে। সম্রাট হুমায়ূন জলাধারের দিকে যাচ্ছেন। তাঁর মন বলছে জলাধারে তিনি জলপদ্ম ফুটে আছে দেখবেন।

খুব কাছ থেকে কেউ একজন বলল, আমি কি সম্রাটের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকতে পারি ? অতি জরুরি কিছু কথা আমার সম্রাটকে বলা দরকার।

সম্রাট ঘাড় ফিরিয়ে বৈরাম খাঁকে দেখলেন। বৈরাম খাঁকে চিন্তিত এবং বিষণ্ন দেখাচ্ছে। হুমায়ূন বললেন, আপনার সঙ্গ আমার সবসময় প্রিয়। আসুন আমরা দুজন জলপদ্মের সন্ধানে যাই। জরুরি আলাপের জন্য সময় অনেক পাওয়া যাবে।

বৈরাম খাঁ এগিয়ে এলেন। হুমায়ূন বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বিনিদ্র রজনী কেটেছে। বলুন জরুরি কথা।

আমি একটি পত্র নিয়ে এসেছি।

হুমায়ূন বললেন, পত্র কে পাঠিয়েছে ? শের শাহ্ ?

না, পত্রটি লেখা হয়েছে শের শাহ্‌কে। লিখেছেন আপনার ভ্রাতা মীর্জা কামরান।

হুমায়ূন জলাধারের দিকে যাচ্ছিলেন, বৈরাম খাঁর কথায় তাঁর থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কথা। তিনি থমকে দাঁড়ালেন না। জলাধার পর্যন্ত গেলেন। সেখানেও জলপদ্ম ফুটেছে। স্বপ্নের মতো সুন্দর না হলেও সুন্দর। একসঙ্গে অনেকগুলি ফুটেছে বলেই সুন্দর। স্বপ্নে একটা জলপদ্মই ছিল। হুমায়ূন আনন্দিত গলায় বললেন, বাহ্!

বৈরাম খাঁ বললেন, পত্রটা কি এখন পড়বেন ?

হুমায়ূন বললেন, এই অপূর্ব দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখতে দিন, তারপর পত্র পাঠ করব।

দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে চাপতে বৈরাম খাঁ বললেন, অবশ্যই। আপনি দৃশ্য দেখুন।

শের শাহ্‌কে লেখা মীর্জা কামরানের পত্র—

> দিল্লীর মহান সম্রাট, জগৎস্বীকৃত বীরপুরুষ মহানুভব শের শাহ্।
>
> আমি দীর্ঘ পত্রালাপে যাচ্ছি না। আমার ভাই হুমায়ূন মীর্জা এই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। মূল কথায় যাই। আমি আমার ভাইকে বন্দি করে আপনার হাতে তুলে দিতে রাজি আছি। বিনিময়ে আমি কী পাব তা দূত মারফত জানালে খুশি হব।
>
> ইতি
>
> আপনার অনুগত
>
> মীর্জা কামরান

হুমায়ূন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে আবারও জলাধারভর্তি পদ্মের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, বৈরাম খাঁ, আপনি কি এই ফুলগুলির আয়ু জানেন?

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি সৈনিক মানুষ। আমার চিন্তা আমার মহান সম্রাটের এবং আমার সৈন্যদের আয়ু নিয়ে।

হুমায়ূন বললেন, অপূর্ব এই ফুল মধ্যরাতে ফোটে এবং মধ্যদুপুরে বুজে যায়। সাত দিন এরকম চলে, তারপর এর আয়ু ফুরায়।

সম্রাট, আমরা কি মূল বিষয়ে আসতে পারি ?

মূল বিষয়ে যেতে মন চাচ্ছে না বলেই পুষ্প বিষয়ে কথা।

অবস্থা যে গুরুতর তা কি বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

আপনার কি মনে হয় না এই মুহূর্তেই কামরান মীর্জাকে বন্দি করা প্রয়োজন ?

তা কি সম্ভব ?

বৈরাম খাঁ বললেন, গত রাতে শেষ প্রহরে আমি তাকে বন্দি করেছি। আপনার হুকুম পাওয়ামাত্র তাঁকে আপনার সামনে উপস্থিত করা হবে।

সম্রাট বললেন, শাবাশ।

বৈরাম খাঁ মাথা নিচু করে প্রশংসা গ্রহণ করলেন। হুমায়ূন বললেন, কেউ চমৎকার কোনো কাজ করলে আমরা বলি শাবাশ। কেন বলি জানেন ?

না।

পারস্য-সম্রাট শাহ আব্বাসের কারণে বলি। শাহ আব্বাস সারা জীবন প্রশংসনীয় সব কাজকর্ম করে গেছেন। সেখান থেকেই শাবাশ শব্দটি এসেছে।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি সৈনিক মানুষ। এত কিছু আমার জানার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধবিদ্যা জানা প্রয়োজন। তারপরেও সম্রাটের কাছ থেকে শিক্ষামূলক প্রতিটি বিষয় আমি মনে রাখি। এখন অধীনের আপনার প্রতি দুটি বিশেষ অনুরোধ আছে।

আপনার যে-কোনো অনুরোধ রাখা হবে। অন্যায় অনুরোধ হলেও আমি রাখব। বলুন কী অনুরোধ ?

আমার দুটি অনুরোধ—কামরান মীর্জাকে বিদ্রোহ এবং গোপন ষড়যন্ত্রের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেবেন। এবং এই দণ্ডাদেশ আজ সূর্যাস্তের আগেই কার্যকর করবেন।

দ্বিতীয় অনুরোধ কী?

যার কারণে আমরা এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে জানতে পারি তাকে পুরস্কৃত করবেন।

সে কে?

তার নাম হরিশংকর।

হরিশংকরকে পুরস্কৃত করা হবে। তাঁকে আমার সামনে উপস্থিত করুন।

কামরান মীর্জাকে কখন উপস্থিত করব?

আসরের নামাজের পর।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি কি আশা করতে পারি, মাগরেবের নামাজের আগেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে?

হুমায়ূন জবাব দিলেন না।

বৈরাম খাঁ বললেন, হাতির পায়ের নিচে মস্তক পিষ্ট করে মৃত্যুই হলো এমন অপরাধীর নিম্নতম শাস্তি।

হুমায়ূন এবারও কিছু বললেন না।

আমি শাস্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখব। আপনার আদেশ পাওয়ামাত্র শাস্তি কার্যকর হবে।

কামরান মীর্জাকে বন্দি করা হয়েছে—এই খবর অন্তঃপুরের রাজমহিষীরা জেনেছেন। কামরান মীর্জার মা গুলরুখ বেগম আতঙ্কে অস্থির। তিনি জানেন তাঁর ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের এই শাস্তির

বিধান। মা হয়ে সন্তানের মৃত্যু তিনি নিতে পারছেন না। তিনি কিছুক্ষণ পরপর জ্ঞান হারাচ্ছেন। দুপুরের দিকে খবর পাওয়া গেল সম্রাট হুমায়ূন এসেছেন, গুলরুখ বেগমের সঙ্গে দেখা করতে। গুলরুখ বেগমের উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। দুজন দাসী তাঁকে ধরাধরি করে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করল।

হুমায়ূন বললেন, মা! আপনি নিশ্চয়ই কামরান মীর্জার কর্মকাণ্ড বিষয়ে অবগত হয়েছেন?

গুলরুখ বেগম হাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হুমায়ূন বললেন, আপনার কি কামরান মীর্জার বিষয়ে কিছু বলার আছে? বাদ আসর তার বিচার বসবে।

গুলরুখ বেগম বললেন, অপরাধী অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে। আমার বলার কিছু নেই।

আপনার করুণ অবস্থা দেখে আমি ব্যথিত। আমি দুপুরে আমার সঙ্গে খাবার গ্রহণের জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি কি আমার সঙ্গে খাবার গ্রহণ করবেন?

না।

হুমায়ূন বললেন, আল্লাহ্‌পাক আপনার মনের কষ্ট দূর করুক। আমিন।

কামরান মীর্জাকে রাখা হয়েছে সাধারণ একটি তাঁবুর ভেতরে। তাঁর দুই হাত পেছন দিকে শক্ত করে বাঁধা। তাঁকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁবুর চারদিকে বৈরাম খাঁ'র অনুগত একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্য। এদের নেতৃত্বে আছে সাদ মুহম্মদ। সে কামরানের সঙ্গে তাঁবুর ভেতর আছে।

কামরান মীর্জা বললেন, তোমার নাম কী ?

সাদ মুহম্মদ।

কামরান বললেন, এটা আবার কেমন নাম! আমি তোমার নাম দিলাম বাদ মুহম্মদ।

আপনার অভিরুচি।

আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি জোহরের নামাজ আদায় করব।

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইশারায় নামাজ পড়ার বিধান আছে। আপনার এখন সেই অবস্থা।

আমি ক্ষুধার্ত। আমার জন্যে দুপুরের খাবারের কী ব্যবস্থা ?

সাদ মুহম্মদ জবাব দিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কামরান বললেন, তুমি ব্যাঙাচির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসো, আমাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হবে কি না।

কাকে ব্যাঙাচি বলছেন ?

বৈরাম খাঁকে। ব্যাঙাচি তার যথার্থ পরিচয়।

আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার হুকুম নেই।

সম্রাটের সামনে আমাকে কখন হাজির করা হবে ?

জানি না। শুনেছি আসরের পর।

আমি আমার ভাইকে চিনি। আমার ভাই যখন শুনবেন আমাকে না খাইয়ে রাখা হয়েছে তিনি রাগ করবেন। তুমি যাও, আমার খাবারের ব্যবস্থা করো।

আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্যে হাতি এবং পাথর প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার উপদেশ, আপনি আহারের কথা চিন্তা না করে আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করুন। এবং আল্লাহ্‌পাকের নাম নিতে থাকুন।

আমি তৃষ্ণার্ত। পানি খাব।

আপনার সামনে থেকে উঠে যাওয়ার হুকুম আমার নেই।

বাদ মুহম্মদ, তোর ধৃষ্টতা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার মনে থাকবে।

হুমায়ূন আচার্য হরিশংকরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দুপুরের খাদ্য গ্রহণ করবেন। হরিশংকর নিরামিশাষী। তাঁর জন্যে ত্রিশ পদের নিরামিষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি ছোঁওয়া বাঁচিয়ে রেশমের আসনে আলাদা বসেছেন।

সম্রাট বললেন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

হরিশংকর বললেন, আমার জীবন আমি আপনাকে নিবেদন করেছি। কাজেই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নেই।

আপনি কীভাবে জানলেন, কামরান মীর্জা শের শাহ্‌'র কাছে পত্র পাঠিয়েছে?

সম্রাটের স্বার্থেই আমি কামরান মীর্জার আস্থাভাজন হয়েছি। আমি এই পত্রের বিষয়ে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি।

আপনি একজনের বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন।

আমি যা করেছি সম্রাটের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে করেছি। সম্রাটের জন্যে যদি আরও হাজারজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়, আমি করব।

আপনি খাদ্য গ্রহণ করছেন না। খাবার নাড়াচাড়া করছেন। কারণ জানতে পারি?

আমি একটি বিষয় নিয়ে কঠিন উদ্বেগের মধ্যে আছি বলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপ পেয়েছে।

উদ্বেগের কারণ জানতে পারি?

শের শাহ্ বিশাল বাহিনী নিয়ে লাহোরের দিকে ছুটে আসছেন। এই বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করা এই মুহূর্তে সম্রাটের পক্ষে সম্ভব না।

এমন পরিস্থিতিতে আপনার পরামর্শ কী?

আমি অতি ক্ষুদ্র একজন। সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। তারপরও বলব সম্রাট যেন কান্দাহারের দিকে চলে যান।

পালিয়ে যেতে বলছেন?

হ্যাঁ। 'য পলায়তি স্ব জীবতি'।

এর অর্থ কী?

এর অর্থ, যে পলায়ন করে সে বেঁচে থাকে।

মীর্জা কামরানকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁর কোমরের তরবারি গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই হাত শক্ত করে পেছনদিকে বাঁধা। সম্রাটের সামনে বন্দিদের এইভাবেই উপস্থিত করানোর রীতি।

কামরান কুর্নিশ করার চেষ্টায় সামান্য নিচু হলেন।

হুমায়ূন বললেন, আমার ভাইকে কেন তোমরা এভাবে আমার সামনে উপস্থিত করেছ? এক্ষুনি হাতের বাঁধন খুলে দাও। গলা থেকে তরবারি নামাও।

তা-ই করা হলো। সম্রাট উঠে এসে ভাইকে আলিঙ্গন করলেন। সম্রাট বললেন, আমার মহান পিতা মৃত্যুর আগে আমাকে বলেছেন, তুমি সবসময় ভাইদের দেখবে ক্ষমাসুন্দর চোখে। আমি তা-ই করছি। ভাই কামরান, এসো তুমি আমার ডানপাশে এসে বসো।

কামরান মীর্জা তা-ই করলেন। অসময়ের একটি তরমুজ এসেছিল খোরাসান থেকে। সম্রাট নিজের হাতে সেই তরমুজের খণ্ড ভাইয়ের

মুখে তুলে দিলেন। এমন আবেগঘন মুহূর্তে দরবারে 'মার্হাবা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কেউ মার্হাবা ধ্বনি দিল না। সম্রাট ভাইকে বিশ্রাম নিতে পাঠালেন।

মধ্যরাতে বৈরাম খাঁ সম্রাটকে ডেকে তুললেন। দুটি দুঃসংবাদ আছে, সম্রাটকে জানানো প্রয়োজন। প্রথম দুঃসংবাদ, শের শাহ্ লাহোরের কাছাকাছি চলে এসেছেন।

দ্বিতীয় দুঃসংবাদ, মীর্জা কামরান কিছুক্ষণ আগেই তার সেনাবাহিনী নিয়ে কান্দাহার রওনা হয়েছেন। সম্রাট হুমায়ূনের সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্য কামরানের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তিনজন ছাড়া বাকি আমীররাও তাই করেছেন।

হুমায়ূন বললেন, বৈরাম খাঁ, এর কারণ কী ?

বৈরাম খাঁ বললেন, বিচারসভায় আপনার কর্মকাণ্ড দেখা হয়েছে আপনার দুর্বলতা হিসেবে। সবাই থাকে সবলের পক্ষে।

আমি কি দুর্বল ?

আপনি অনেক বেশি সবল। এটা ধরার ক্ষমতা তাদের নেই।

হুমায়ূন বললেন, সবকিছুই তিনবার করে ঘটে। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য আসে পরপর তিনবার। তুমি আমাকে দুটি দুঃসংবাদ দিয়েছ। এখন তৃতীয়টি দাও।

বৈরাম খাঁ বললেন, সম্রাট যদি কামরান মীর্জাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন তাহলে সেই আদেশ দ্রুত কার্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া ছিল। হাতি এবং হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করার জন্যে পাথর ছিল। কামরান মীর্জা সেই পাথরে সাদ মুহম্মদকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করেছেন।

সাদ মুহম্মদ কে ?

সম্রাটের এবং আমার অতি অনুগত একজন। তার হাতেই কামরান মীর্জা বন্দি হয়েছিলেন।

বৈরাম খাঁ, আপনি কি নিয়তি বিশ্বাস করেন ?

করি না। কিন্তু আপনি বললে করব।

সম্রাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি বলছি না। স্বয়ং আল্লাহ্পাক নিয়তির কথা বলেছেন। সূরা বনি ইসরাইলে বলা আছে, 'আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি।'

নিয়তির হাতে সম্রাট নিজেকেই সমর্পণ করলেন। স্ত্রী হামিদা বানু এবং অল্পকিছু অনুগতজন নিয়ে শুরু হলো তাঁর পথেপ্রান্তরে পালিয়ে থাকার দিন। তাঁকে তাড়া করে ফিরল আরেক নিয়তির সন্তান শের খাঁ। ভুল বললাম, খাঁ না। তিনি এখন শের শাহ্।

এশার নামাজ শেষ হয়েছে। মীর্জা কামরান নামাজ শেষ করে নৈশকালীন মদের আসরে বসেছেন। আসরে ছয়জন আমীর উপস্থিত। তাদের হাতে রুপার পানপাত্র। মীর্জা কামরানের হাতে সোনার পানপাত্র। মীর্জা কামরান ক্ষুব্ধ চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁর মেজাজ সপ্তমে। তবে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন। তাঁর মেজাজ খারাপের প্রধান কারণ, স্বর্ণের পানপাত্রে তাঁকে ছাড়াও আরেকজনকে মদ পরিবেশন করা হয়েছে। তার নাম বরকত খাঁ। বরকত খাঁকে কান্দাহার পাঠিয়েছেন শের শাহ্-পুত্র জালাল খাঁ। বরকত খাঁ'র মর্যাদা একজন আমীরের চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাঁকে স্বর্ণপানপাত্রে মদ পরিবেশন করে মীর্জা কামরানকে ছোট করা হয়েছে। মীর্জা কামরান ভেবে পাচ্ছেন না, স্বর্ণপাত্রের এই ভুলটা কারা করেছে! খেদমতগাররা এমন বড় ভুল করবে না। নিশ্চয়ই এখানে আমীরদের ভূমিকা আছে।

বরকত খাঁ পানপাত্রে চুমুক দিচ্ছেন না। এটিও এক ধরনের অপমান। মীর্জা কামরান বললেন, আপনার কি নেশার পানীয় বিষয়ে আসক্তি নেই?

বরকত খাঁ বললেন, জি না জনাব। আমি ধর্মভীরু মানুষ। ধর্মের অনুশাসন মেনে চলি। পরকালে হুররা যে মদিরা পরিবেশন করবেন তার জন্যে অপেক্ষা করাটাকে উত্তম মনে করি।

মীর্জা কামরান বললেন, আপনি কি জালাল খাঁ'র কাছ থেকে কোনো পত্র এনেছেন ?

জি না জনাব। জালাল খাঁ তার পিতার স্বভাব পেয়েছেন। কলমের খেলার চেয়ে অসির খেলা তার অধিক পছন্দ।

মীর্জা কামরান পানপাত্রে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললেন, জালাল খাঁ আপনাকে পাঠিয়েছেন কেন ?

আপনার কুশল জানার জন্যে। আপনার শরীর কেমন জনাব ?

শরীর ভালো।

পেটের পীড়ার ঘনঘন আক্রমণে শিকার হন বলে শুনেছি। পেট কি ঠিক আছে ?

পেট ঠিক না থাকলে আপনি কি ওষুধ দেবেন ?

সেই যোগ্যতা আমার নাই জনাব। আমি সামান্য দূত। কথা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার বাহনবিশেষ।

মীর্জা কামরান বললেন, জালাল খাঁ'র কাছ থেকে কী কথা এনেছেন বলুন শুনি।

আমি কথা এনেছি আপনার জন্যে। আপনার আমীরদের জন্যে না। তাদের সামনে আমি মুখ খুলব না।

ওরা সবাই আমার বিশ্বস্ত।

বরকত খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, এদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিন আগে হুমায়ূনের বিশ্বস্ত ছিলেন। আমীরদের বিশ্বস্ততা আর বেশ্যাপল্লীর বেশ্যাদের শারীরিক পবিত্রতা তুল্যমূল্য।

মীর্জা কামরান কঠিন ভাষায় বললেন, আপনি আমার সামনে আমার আমীরদের অপমান করছেন!

দুঃসময়ে কোনো অপমান গায়ে মাখতে হয় না। মোঘলদের এখন চরম দুঃসময়।

মীর্জা কামরান বললেন, আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমার আমীরদের সামনেই বলতে হবে।

বরকত খাঁ বললেন, আমার কিছুই বলার নাই জনাব। আপনার কুশল জানতে এসেছিলাম। কুশল জানা হয়েছে। সন্তোষ লাভ করেছি। এখন অনুমতি পেলে বিদায় হব।

বলতে-বলতে বরকত খাঁ উঠে দাঁড়ালেন। লোকটির ঔদ্ধত্য এবং দুঃসাহস দেখে মীর্জা কামরানের পিত্তি জ্বলে গেল। প্রধান আমীর বললেন, আমরা চলে যাচ্ছি। আপনারা আলোচনায় বসুন। সবার শান্তির জন্যেই আলোচনা জরুরি।

মীর্জা কামরান ইশারায় বরকত খাঁকে বসতে বললেন। আমীররা ঘর খালি করে চলে গেল। দুজন খিদমতগারকেও চলে যেতে হলো।

বরকত খাঁ বললেন, এখন মূল কথায় আসা যাক। জালাল খাঁ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন, আপনি শের শাহ্'র জন্যে অর্থাৎ দিল্লীর মহান সম্রাটের জন্যে কী করতে পারেন।

মীর্জা কামরান বললেন, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিলে অনেক কিছুই করতে পারি। আপনারা আমাকে শান্তি দেবেন, আমি আপনাদের শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করব।

আপনার কি ধারণা দিল্লীর সম্রাট অশান্তিতে আছেন ?

অবশ্যই। আপনারা হুমায়ূন-আতঙ্কে ভুগছেন। তাঁকে তাড়া করে ফিরছেন। আপনাদের ধারণা, তিনি দ্রুত শক্তি সংগ্রহ করবেন। আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেবেন। যাই হোক আমি সরাসরি বলি, আমি আমার বড়ভাইকে জীবিত বা মৃত আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারি। তার বিনিময়ে আমি কী পাব ?

বরকত খাঁ বললেন, রেশমের কাজ করা মণিমুক্তা বসানো একজোড়া পাদুকা শের শাহ্ নিশ্চয়ই আপনাকে দেবেন।

রসিকতা করছেন ?

রসিকতা কেন করব! শের শাহ্ পাদুকা উপহার দিতে পছন্দ করেন। তিনি যোধপুরের রাজা মালদেবকে একজোড়া পাদুকা উপহার দিয়েছেন। ঘটনার সত্যতা সন্ধান করলেই জানতে পারবেন। যাই হোক, জালাল খাঁ আমাকে পাঠিয়েছেন হুমায়ূনকে বন্দি করার বিষয়ে আপনার সাহায্য কামনা করতে। বিনিময়ে আপনি লাহোর ফিরে পাবেন। শুনেছি লাহোরের জলবায়ু আপনাকে পীড়ামুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

মীর্জা কামরান বললেন, শুধু মুখের কথা! এই বিষয়ে কোনো চুক্তি হবে না ?

বরকত খাঁ বললেন, যাদের মুখের কথা মূল্যহীন তারাই চুক্তির জন্যে লালায়িত হয়। জালাল খাঁ'র মুখের কথা মূল্যহীন না।

আমি কবে লাহোর যেতে পারি ?

ইচ্ছা করলে এখনই রওনা দিতে পারবেন। পান বেশি করেছেন, এই অবস্থায় রওনা দেওয়া ঠিক হবে না। বলতে ভুলে গেছি, জালাল খাঁ আপনার জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন। উপহার আপনার পছন্দ হবে।

কী উপহার ?

বাংলা মুলুক থেকে আনা দুজন হিজড়া। হিজড়ার বিষয়ে আপনার আগ্রহের কথা আমরা জানি। শারীরিক ত্রুটির কারণে ওদের অন্য গুণাবলি বিকশিত হয়।*

আমি উপহার পেয়ে খুশি হয়েছি, ওনাকে ধন্যবাদ।

বরকত খাঁ বললেন, আপনি আমীরদের আসরে ডাকুন।

---

*বঙ্গদেশের হিজড়াদের মোঘল হেরেমে কদর ছিল। রাজপুরুষরা যৌন কদর্যতামুক্ত ছিলেন না। ভারতবর্ষের বাইরেও তাদের চাহিদা ছিল।

আনন্দযাত্রা অব্যাহত থাকুক। জালাল খাঁ'র উপহার কেমন তাও দেখুন। আমি বিদায় নিচ্ছি।

মীর্জা কামরানের আনন্দফুর্তি সারা রাত স্থায়ী হলো। হিজড়াদের নৃত্যগীত মীর্জা কামরানকে বিমোহিত করল।

কিছুক্ষণের জন্যে আমরা আচার্য হরিশংকরের কাছে ফিরে যাই। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হুমায়ূনের সঙ্গী হন নি। তিনি এখন আছেন পুণ্যধাম কাশিতে।

তাঁর হাতে স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রার সংগ্রহ ভালো। হুমায়ূন তাঁকে দুটি রুবি পাথরও দিয়েছেন। হরিশংকরের বাকি জীবন ভালোমতোই যাওয়ার কথা।

তিনি কাশিতে একটি ঘর ভাড়া করেছেন। একজন পাচক রেখেছেন, দারোয়ান রেখেছেন। তাঁর সময় কাটে মন্দিরে মন্দিরে।

একদিনের কথা, তিনি মন্দিরে সন্ধ্যাপূজা দেখে ঘরে ফিরে দেখেন তার বিছানায় হুমায়ূন-কন্যা আকিকা বেগম। সে হাসিমুখে বসে আছে।

হরিশংকর বুঝলেন চোখের ধাক্কা। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে রাম নাম নিয়ে চোখ খুললেন, আকিকা বেগম আগের জায়গাতেই বসা। সে মিষ্টি গলায় বলল, আমার বাবা সম্রাট হুমায়ূন কোথায় ?

হরিশংকর মূর্ছিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

জোছনাপ্লাবিত রজনী। রাজ্যহারা সম্রাট দলবল নিয়ে পালাচ্ছেন। তিনি যাচ্ছেন সিন্ধুর দিকে। তাঁর সারা দিন ঘোড়ার পিঠে কেটেছে। সন্ধ্যায় মাগরেবের নামাজের কিছু বিরতি নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করেছেন।

হুমায়ূনকে অনুসরণ করছেন কুতুব খাঁ। শের শাহ্'র আরেক পুত্র। তার ওপর নির্দেশ হুমায়ূনকে হিন্দুস্থান-ছাড়া করতে হবে। তাঁর ওপর সরাসরি চড়াও হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মধ্যরাতে হামিদা বানু স্বামীকে বললেন, তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন। শরীর টানছে না।

হুমায়ূন সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন। খোলা প্রান্তর। চাঁদে আলোর ফিনকি ফুটেছে। অচেনা ঝাঁকড়া একটা গাছের নিচে চাদর পেতে বসেছেন হামিদা বানু। গাছ থেকে অনেকটা দূরে রাতের খাবারের আয়োজন হচ্ছে। খিচুড়িজাতীয় খাদ্য তৈরি হচ্ছে। রসদ ফুরিয়ে আসছে। খাদ্য তৈরিতেও সাবধানতা।

ক্লান্ত ঘোড়ার দলকে পানি এবং গম খাওয়ানো হচ্ছে। এদেরকে সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

হুমায়ূন একা একা হাঁটছিলেন, হঠাৎ হামিদা বানুর খিলখিল হাসির শব্দ শুনে এগিয়ে গেলেন। এই অবস্থায় এত সুন্দর করে কেউ হাসতে পারে না।

হামিদা বানু স্বামীকে দেখে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসলেন। হুমায়ূন বিস্মিত গলায় বললেন, কী হয়েছে হামিদা?

হামিদা বললেন, কিছু হয় নি তো।

তুমি হাসছিলে।

আপনার এমন কোনো নির্দেশ আছে যে হাসা যাবে না?

এই অবস্থায় কেউ আনন্দে হাসছে দেখে বিস্মিত হয়েছি। হাসার মতো কোনো কারণ কি ঘটেছে?

ঘটেছে। আপনি আমার পাশে বসুন, তারপর বলছি কী ঘটেছে।

হুমায়ূন হামিদা বানুর পাশে বসলেন। হামিদা বানু গলা নামিয়ে বললেন, আপনার হাত এগিয়ে দিন। হাত ধরে বলব।

হুমায়ূন হাত এগিয়ে দিলেন। হামিদা বানু স্বামীর হাত ধরতে-ধরতে বললেন, ভাগ্য আপনাকে অতি সাধারণ একজন মানুষের

কাতারে নিয়ে এসেছে। এমন সাধারণ যে আমি ইচ্ছা করলেই এখন আপনার হাত ধরতে পারি। এই আনন্দেই হাসছি।

হুমায়ূন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। স্ত্রীর কথার উত্তরে কিছু বললেন না।

হামিদা বানু বললেন, আপনি একসময় কথায় কথায় শের বলতেন। অনেকদিন আপনার মুখ থেকে শের শুনি না। জোছনা নিয়ে কোনো শের কি আপনার জানা আছে?

না।

বিয়ের রাতে আমাকে নিয়ে যে দীর্ঘ কবিতাটি লিখেছিলেন সেটি বলুন শুনি।

হামিদা! কবিতাটা আমার মনে নেই।

একটা লাইনও মনে নেই?

না।

মনে করার চেষ্টা করুন। আজ রাতে আমি আপনার কাছ থেকে কবিতা শুনবই। যদি মনে না পড়ে নতুন কবিতা লিখবেন। কলমচিকে কাগজ-কলম নিয়ে আসতে বলুন। চাঁদের আলো তীব্র। এই আলোতে লিখতে আপনার অসুবিধা হবে না।

হামিদা! তোমাকে খুব অস্থির লাগছে। কী হয়েছে বলো তো?

আপনার মুখ থেকে কবিতা শুনতে ইচ্ছা করছে। এর বেশি কিছু না।

হুমায়ূন বললেন, আমি কি তোমাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

হামিদা বানু বললেন, সম্রাট কখনো অনুরোধ করেন না। আদেশ করেন।

তুমি ভালো করেই জানো আমি রাজ্যহারা সাধারণ একজন। আমি আমার স্ত্রীকে অবশ্যই অনুরোধ করতে পারি।

কী অনুরোধ বলুন।

তুমি কান্দাহারে ফিরে যাও। তোমার পরিচিত প্রিয়জনরা সবাই সেখানে আছেন। আমার সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। কখন কোন বিপদ ঘটে।

হামিদা বানু কঠিন গলায় বললেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমার মন বলছে একদিন আপনি রাজত্ব ফিরে পাবেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন। তখন আপনার সামনে আমাকে যেতে হবে কুর্নিশ করতে করতে। এই যে আমরা হাত ধরাধরি করে গাছের নিচে বসে আছি এরকম তো হবে না। এই সুযোগ আমি ছাড়ব না। আমি সারাক্ষণ থাকব আপনার পাশে।

কে যেন পেছন দিকে এসেছে। শরীর চাদরে ঢাকা বলে তাকে চেনা যাচ্ছে না।

হুমায়ূন বললেন, কে ?

আমি বৈরাম খাঁ। আমাদের এক্ষুনি রওনা হতে হবে। রাতের খাবার খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

ঘোড়া কি প্রস্তুত ?

জি জাহাঁপনা।

হুমায়ূন তার স্ত্রীকে হাত ধরে তুললেন। কোমল গলায় বললেন, ক্লান্তভাবটা একটু কি কমেছে ?

হামিদা বানু বললেন, হ্যাঁ কমেছে। আমরা যাচ্ছি কোথায় ?

বৈরাম খাঁ জানে। আমি জানি না।

হামিদা বানু বললেন, আমি আপনার মুখ থেকে একটা শের না শুনে ঘোড়ায় উঠব না।

হুমায়ূন বললেন,

“একজন প্রেমিকের কাছে চন্দ্র হলো তার
প্রেমিকার মুখ।
আর জোছনা হলো প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাস।”

হামিদা বানু বললেন, বাহ্ সুন্দর শের! আপনাকে একটা কথা বলা হয় নি। আমি সন্তানসম্ভবা। আমার বিশ্রামের দিকে আপনাকে একটু নজর দিতে হবে। দিন-রাত ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারব না।

হতভম্ব হুমায়ূন বললেন, কী বললে ?

হামিদা বানু হাসতে হাসতে বললেন, একবার তো লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলেছি, আর বলতে পারব না।

হুমায়ূনের বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। জোছনা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। হুমায়ূন হামিদা বানুর পাশাপাশি যাচ্ছেন। দুজনের কারও মুখেই কোনো কথা নেই। ঘোড়া ক্লান্ত হলেও ছুটছে তীব্র গতিতে।

হামিদার গা গুলাচ্ছে। ঘোড়ার গায়ের ঘামের গন্ধ এখন আর সহ্য হচ্ছে না। তিনি কথাবার্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলেন। হুমায়ূনকে বললেন, আমাদের পরিকল্পনাটা কী ? আমরা কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াব ?

হুমায়ূন জবাব দিলেন না। হামিদা বানু বললেন, উদ্দেশ্যহীন পালিয়ে বেড়ানো বন্ধ করে আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করতে হবে....

হামিদা বানুর কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোট কামানের গোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পরপর কয়েকবার। হুমায়ূনকে ধাওয়া করা বাহিনীর কামান নিয়ে আসার কথা না। ব্যাপারটা কী ?

বৈরাম খাঁ'র নির্দেশে হুমায়ূনের বাহিনী মূল পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়া

ঘোড়ার মতো একটি প্রাণীর পক্ষে যথেষ্ট জটিল। এই কাজটি ঘোড়ারা ভালোমতোই করছে। তারা বিপদ আঁচ করতে পারছে।

হামিদা বানু বললেন, চমৎকার বুনো ফুলের সুবাস পাচ্ছি। আপনি কি পাচ্ছেন?

হুমায়ূন বললেন, পাচ্ছি।

হামিদা বানু বললেন, আমার কী সৌভাগ্য সুন্দর ফুলের ঘ্রাণ পেলাম! আল্লাহ্‌পাকের দরবারে হাজার শুকরিয়া।

মীর্জা কামরান লাহোর যাত্রা করবেন। জ্যোতিষী শুভক্ষণ ঠিক করে দিয়েছে। ফজরের নামাজের পরপরই যাত্রা শুরু করতে হবে। পরের শুভক্ষণ মধ্যনিশা। মীর্জা কামরান প্রথম শুভক্ষণ বেছেছেন।

কান্দাহারের রাজমহিষীরা সবাই যাবেন। কান্দাহারে থাকবেন আসকারি মীর্জা।

যাত্রা শুরুর আগে মীর্জা কামরান তাঁর মা গুলরুখ বেগমের কাছে গেলেন দোয়া নেওয়ার জন্যে। গুলরুখ বেগম লাহোর যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

মীর্জা কামরান মা'র কাছ থেকে বিদায় নিলেন। গুলরুখ বেগম বললেন, আমি মা হিসেবে তোমার মঙ্গল কামনা করছি। যাত্রা শুভ হোক। আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

বলুন কী প্রশ্ন ?

তুমি নাকি তোমার বড়ভাই হুমায়ূনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেবে ? তাকে ধরিয়ে দেবে শের শাহ্'র হাতে ?

কোথায় শুনলেন এমন কথা ?

গুলরুখ বেগম বললেন, দরবারের সব কথাই অন্তঃপুরে আসে। অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

মীর্জা কামরান বললেন, আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তার

আগে আমার চারটি প্রশ্ন আছে। আপনাকে দীর্ঘ জবাব দিতে হবে না। দীর্ঘ জবাব শোনার মতো সময় আমার হাতে নেই। শুধু 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবেন। প্রথম প্রশ্ন, রাজ্যহারা হুমায়ূন কি এখন বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গীসাথীরা একে একে সরে পড়ছে। সৈন্যবাহিনীর প্রায় সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে। হ্যাঁ নাকি না ?

হ্যাঁ।

তৃতীয় প্রশ্ন, রাজ্যহারা হুমায়ূনের কি এখন কোনো ভবিষ্যৎ আছে ?

গুলরুখ বেগম জবাব দিলেন না। মীর্জা কামরান বললেন, আপনি জবাব দেন নি, কাজেই ধরে নিলাম এই প্রশ্নের উত্তরও হ্যাঁ।

চতুর্থ এবং শেষ প্রশ্ন, আপনি কি চান আপনার মহান স্বামী যে মোঘল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা টিকে থাকুক ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি যা করছি তার বিকল্প নেই। আমি লাহোরে শক্তি সংগ্রহ করব।

তুমি তোমার বড়ভাইয়ের পাশে দাঁড়াবে না ?

মীর্জা কামরান বললেন, অন্যের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব না।

এই ভাই তোমার প্রতি যে মমতা দেখিয়েছে তা তুমি বিস্মরণ হয়েছ ?

মমতা দুর্বলের অস্ত্র। আমি দুর্বল না।

গুলরুখ বেগম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এর অর্থ কি এই যে তুমি তোমার ভাইকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে ?

মীর্জা কামরান চুপ করে রইলেন। গুলরুখ বেগম কঠিন গলায় বললেন, মা হিসেবে তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ—ভাইকে শের শাহ্‌'র হাতে তুলে দেওয়ার আগে তুমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবে। তোমার প্রতি সে যে মমতা এবং ভালোবাসা দেখিয়েছে এটা হবে তার পুরস্কার।

মেয়েলি কথাবার্তা শোনার সময় আমার নেই মা।

তোমার ভাই কিন্তু শুনতো।

শুনে শুনেই তো আজ তাঁর এই অবস্থা। শিয়ালের মতো সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁকে তাড়া করছে শিকারি কুকুর।

তার মতো শিয়াল হতে পারা মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা তুমি রওনা হও। তোমাকে দেরি করিয়ে দিলাম।

হুমায়ূন আছেন সিন্ধুর নাদান দুর্গে। এই দুর্গের প্রধান উছি বেগ দুর্গ হুমায়ূনের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্গের বাইরে অবস্থান নিয়েছেন। উছি বেগের উদ্দেশ্য পরিষ্কার না। এটা কি কৌশলে হুমায়ূনকে বন্দির চেষ্টা ? হুমায়ূন দুর্গে বন্দি থাকবেন। শের শাহ্‌'র কাছে খবর যাবে। বিশাল পুরস্কারের বিনিময়ে উছি বেগ হুমায়ূনকে তুলে দেবেন শের শাহ্‌'র হাতে ?

হামিদা বানু দুর্গের একটি কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই বিশ্রাম তাঁর জন্যে প্রয়োজন ছিল। এই মুহূর্তে তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না। তাঁর শরীর খুবই খারাপ করেছে। গায়ে প্রবল জ্বর। সেবা করার কেউ নেই।

বৈরাম খাঁ'র হাতে এখন সৈন্যসংখ্যা মাত্র নয় শ'। তবে এরা সবাই সুশিক্ষিত। এক শ' তীরন্দাজ আছে, যাদের নিশানা অব্যর্থ। বৈরাম খাঁ দুর্গপ্রাচীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় তাদের বসিয়ে দিয়েছেন।

ঘোড়সওয়ার বাহিনী দুর্গের মূল ফটকের কাছে রাখা হয়েছে। পাথরের তৈরি দুর্গ হালকা কামান দেগেও কিছু করা যাবে না।

উছি বেগের সঙ্গে বৈরাম খাঁ বৈঠকে বসেছেন। উছি বেগের উদ্দেশ্য যদি ধরা যায়। উছি বেগ বারবারই বলছেন—আমি একজন বিপদগ্রস্ত রাজ্যহারা মানুষকে সাহায্য করছি, এর বেশি কিছু না।

বৈরাম খাঁ বললেন, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে দেখা যায় কিন্তু রাজ্যহারা মানুষকে কেউ সাহায্য করে না।

উছি বেগ বললেন, কেউ করে না তা ঠিক না, আমি তো করছি।

আপনি কি পুরস্কারের আশায় এই কাজ করছেন ?

না। ভালো কাজ পুরস্কারের লোভে কেউ করে না।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনার মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ। কোনো এক শুভক্ষণে সম্রাট হুমায়ূন নিশ্চয়ই আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

আপনারা যত দিন ইচ্ছা এই দুর্গে থাকবেন। দুর্গে রসদ নেই, পানি নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। হাম্মামখানায় কিছু পানি আছে, তাতে আজকের রাতটা চলবে। ভোর হোক, সব ব্যবস্থা হবে।

আল্লাহ্‌পাক আপনার মঙ্গল করুন।

হাম্মামখানায় পানি পাওয়া গেল না। হাম্মামখানার কল খোলা, সব পানি বের হয়ে গেছে। দুর্গের রসদঘর শূন্য। একদানা চাল বা গম পাওয়া গেল না। বৈরাম খাঁ প্রমাদ গুনলেন। তিনি নিশ্চিত উছি বেগের উদ্দেশ্য ভালো না।

ভোরবেলা রসদ বা পানি কোনোটাই এল না। পানিশূন্য অবস্থায় সারা দিন কাটল। জওহর আবতাবচির সংগ্রহে দুই মশক পানি আছে। হুমায়ূনের প্রয়োজন মিটবে, কিন্তু অন্যদের কী হবে ? বৈরাম খাঁ উছি বেগের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। উছি বেগ দুর্গের ভেতর

আসতে রাজি হলেন না। বৈঠক হবে উছি বেগের তাঁবুতে। বৈরাম খাঁ তাতেই রাজি। নিরস্ত্র অবস্থায় তিনি উছি বেগের তাঁবুতে ঢুকলেন। তাঁদের কথোপকথন—

বৈরাম খাঁ : সম্রাট-পত্নী হামিদা বানু সন্তানসম্ভবা। তিনি অসুস্থ। প্রবল জ্বরে কাতর।

উছি বেগ : শুনে দুঃখিত হলাম। আমার সঙ্গে কোনো চিকিৎসক নেই। থাকলে পাঠিয়ে দিতাম।

বৈরাম খাঁ : দুর্গে পানি নেই। খাবার নেই।

উছি বেগ : আমি এই বিষয়ে কিছু করতে পারছি না। চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারি নাই। আমাদেরও খাদ্য-পানির সংকট।

বৈরাম খাঁ : বাদশাহ হুমায়ূন আপনার কাছে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করতে আমাকে বলেছেন। তিনি নিজ পত্নীর অবস্থা দেখেই এমন একটা প্রস্তাব করছেন।

উছি বেগ : বলুন কী প্রস্তাব।

বৈরাম খাঁ : উনার সঙ্গে একটি বহু মূল্যবান রত্ন আছে। রত্নটি আপনি উপহার হিসেবে পাবেন।

উছি বেগ : রত্নটির নাম কি কোহিনুর ?

বৈরাম খাঁ : হ্যাঁ, কোহিনুর। আপনি খোঁজখবর ভালোই রাখেন। দুর্গপ্রধান না হয়ে আপনার রাজ্যপ্রধান হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, সম্রাটের একটি শর্ত আছে।

উছি বেগ : শর্ত দেওয়ার মতো অবস্থায় আপনার সম্রাট নেই, তার পরেও শুনি।

বৈরাম খাঁ : আপনি আমাদের সিন্ধুনদ পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। পানি এবং রসদ সরবরাহ করবেন।

উছি বেগ : কোহিনুর কখন পাব ?

বৈরাম খাঁ : পানি এবং রসদ নিয়ে আপনার লোকজন ঢুকবে। তাদের সঙ্গে আপনিও দুর্গে ঢুকবেন। তখনই আপনার হাতে কোহিনুর দিয়ে দেওয়া হবে। আপনি কি রত্ন চেনেন ?

উছি বেগ : না।

বৈরাম খাঁ : তাহলে কী করে বুঝবেন এটিই মহামূল্যবান কোহিনুর ?

উছি বেগ : আমার এখানে একজন রত্নব্যবসায়ী আছে। সে চিনবে।

বৈরাম খাঁ : আপনি তাহলে আগে থেকেই প্রস্তুত। কোহিনুরের জন্যে এই কাণ্ড করছেন ?

উছি বেগ : আপনার অনুমান সঠিক। কোহিনুর আগে আমার হাতে পৌঁছতে হবে। পানি এবং রসদ পাথর হাতে পাওয়ার পর সরবরাহ করা হবে।

বৈরাম খাঁ : পাথর আপনি নিজে নেবেন ? নাকি আমাকে নিয়ে আসতে হবে ?

উছি বেগ : আপনি নিয়ে আসবেন। রত্নব্যবসায়ী আপনার সঙ্গে যাবে। সে রত্ন ঠিক আছে কি না দেখে নেবে।

বৈরাম খাঁ : রত্নব্যবসায়ীকে আমার সঙ্গে দিন। আমি পাথর নিয়ে ফিরছি। আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। কোহিনুর বিশেষ জায়গায় লুকানো। খুঁজে বের করতে সময় নেবে। এর মধ্যে আপনি পানি এবং রসদের ব্যবস্থা করুন।

উছি বেগ : বিলম্ব হলে সমস্যা নেই।

রত্নবণিকের নাম মহাবীর। সে জাতিতে জৈন, পরম অহিংস। মুখে-নাকে পাতলা কাপড় পরে রাখে, যেন মশা-মাছি নাকে-মুখে ঢুকে মারা

না যায়। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে যেন পায়ের নিচে পড়ে পিঁপড়া মারা না যায়।

রত্নবণিককে দুর্গে ঢুকিয়েই দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। বৈরাম খাঁ বললেন, আমরা যে মহাবিপদে পড়েছি তা কি বুঝতে পারছেন ?

মহাবীর বলল, আমি ব্যবসায়ী মানুষ এইসব কিছু বুঝি না। কোহিনুর আমাকে দেখাবেন। আমি বলব আসল জিনিস কিংবা নকল। আমার কাজ শেষ।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনি মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী হলো আহত ব্যাঘ্র। আমি আহত ব্যাঘ্র।

খাঁ সাহেব, গেট খুলে দেন। আমি অহিংস মানুষ। পিঁপড়া পর্যন্ত মারি না।

আপনাকে পিঁপড়া মারতে হবে না। খামাখা পিঁপড়া কেন মারবেন ? আপনি দেখবেন আমরা কী করে মানুষ মারি।

খাঁ সাহেব, গেট খুলে দেন।

এক্ষুনি গেট খুলে দেব। আমরা দুজন গেট দিয়ে বের হব। আমার হাতে থাকবে রেশমি রুমালের ভেতর সাধারণ একখণ্ড পাথর। আমি রুমাল উঁচু করে উছি বেগের তাঁবুর দিকে এগুতে থাকব। উছি বেগ তাঁবু থেকে ছুটে আসবে। আর তখনই আমার তীরন্দাজরা তাকে মারবে। উছি বেগের মৃত্যুবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আমার ঘোড়সওয়ার বাহিনী বের হবে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবে। আপনি মানুষের মৃত্যু দেখবেন।

হতভম্ব মহাবীর বলল, আপনার লোক যখন তীর ছুঁড়বে সেই তীর তো আমার গায়েও লাগতে পারে।

সম্ভাবনা আছে, তবে আমার তীরন্দাজদের হাতের নিশানা ভালো। তাদের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

পরের অংশ সংক্ষিপ্ত। উছি বেগ প্রথম তীরের আঘাতেই ধরাশায়ী হলেন। তার দলের লোকদের হতভম্ব ভাব কাটার আগেই বৈরাম খাঁ'র বাহিনী বের হয়ে এল। ভারতবর্ষে সেনাপতির মৃত্যু মানেই যুদ্ধে পরাজয়। উছি বেগের লোকজন পালাতে শুরু করেছে। বৈরাম খাঁ'র জন্যে একটি ঘোড়া এবং তরবারি নিয়ে আসা হয়েছে। বৈরাম খাঁ লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠতেই যুদ্ধ শেষ।

হুমায়ূন তাঁর বাহিনী নিয়ে নির্বিঘ্নে সিন্ধুনদ পার হলেন। উছি বেগের সৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া রসদ এবং পানির এখন আর অভাব নেই।

হামিদা বানুকে নৌকায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। তিনি একবার বললেন, আমরা কোথায়?

হুমায়ূন বললেন, সিন্ধুনদ পার হচ্ছি।

পানি খাব।

হুমায়ূন বললেন, যত ইচ্ছা পানি খাও। পানির অভাব নেই।

মহাবীর তীরবিদ্ধ হয় নি। সে বৈরাম খাঁ'র সঙ্গে আলাদা নৌকায় উঠেছে। মহাবীর বৈরাম খাঁ'র দিকে তাকিয়ে বলল, আমার নাম মহাবীর কিন্তু আপনি সত্যি মহাবীর এবং অতি বিচক্ষণ।

বৈরাম খাঁ হাই তুলতে-তুলতে বললেন, মানুষ মারা দেখে মজা পেয়েছেন?

মহাবীর বলল, এইসব কী বলেন? আমরা অহিংস জাতি। পিঁপড়া পর্যন্ত মারি না।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে জুটেছেন কী জন্যে?

কোহিনুর হীরা এক নজর দেখে জীবন সার্থক করার ইচ্ছা। সুযোগ কি পাব?

অবশ্যই পাবেন। তবে আগে কয়েকটা পিঁপড়া মারতে হবে। পারবেন ?

মহাবীর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা পিঁপড়া মারতে রাজি আছি। এর বেশি পারব না।

বৈরাম খাঁ বললেন, পিঁপড়া মারতে হবে না। পিঁপড়া মারা ছাড়াই আপনাকে কোহিনুর দেখাব। তবে কোহিনুর সামান্য পাথর ছাড়া কিছু না। জীবন্ত সঠিক মানুষ হলো আসল কোহিনুর। পেছনের নৌকার দিকে তাকান। রাজ্যহারা সম্রাট হুমায়ূন স্ত্রীর হাত ধরে বসে আছেন। উনিই আসল কোহিনুর। দেখেছেন ?

হুঁ। আপনারা যাচ্ছেন কোথায় ?

শুধুমাত্র নদী জানে সে কোনদিকে যাচ্ছে। তার যাত্রা সমুদ্রের দিকে। মানুষ নদী না বলেই সে কোনদিকে যাচ্ছে তা জানে না।

মহাবীর বলল, আপনার সাহস এবং বীরত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি অর্থের যোগান দেব, আপনি সৈন্য সংগ্রহ করবেন। সৈন্য হচ্ছে তীর্থের কাক। ভাত ছিটালেই আসে।

বৈরাম খাঁ বললেন, অর্থের বিনিময়ে আপনাকে কোহিনুর দিতে হবে ?

হুঁ।

বৈরাম খাঁ বললেন, শুনুন মহাবীর। কোহিনুর বিক্রি হয় না। এটা উপহার হিসেবে পাওয়া যায় কিংবা তলোয়ারের সাহায্যে কেড়ে নিতে হয়। আর কথা না বলে নদীর শোভা দেখুন।

প্রেতযোনির হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা আচার্য হরিশংকর করেছেন। তান্ত্রিকের কাছ থেকে 'রাম কবচ' নিয়েছেন। গলায় পরেছেন অষ্টধাতু রক্ষাকবচ। তাঁর বিছানার নিচে সরিষা দানা, দরজায় ঝুলছে লোহার শিকল। প্রেতযোনি সরিষা এবং লোহা ভয় পায়। তারা আগুনও ভয় পায়। হরিশংকরের খাটের নিচে মাটির মালশায় দিনরাতই কয়লার আগুন জ্বলে। সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে তিনি বয়রা নামে এক কিশোরকে চাকরি দিয়েছেন।

প্রেতযোনির হাত থেকে ব্যাপক সুরক্ষা গ্রহণের ফল ফলেছে, হরিশংকর এখন আর খাটের উপর আকিকা বেগমকে পা ঝুলিয়ে বসতে দেখেন না। হরিশংকর ধর্মকর্মে ব্যাপক মনোযোগ দিয়েছেন। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করেন। গঙ্গায় বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে সূর্যপ্রণাম দিয়ে দিন শুরু করেন। মন্দিরে মন্দিরে ঘোরেন। সাধু-সন্তদের ধর্ম-উপদেশ শোনেন। দুপুরে কাকভোজন করান। কাকের রূপে আত্মারা মর্ত্যে ঘোরেন। কাকভোজন করালে আত্মাদের শান্তি হয়। পুণ্যলাভ হয়।

সন্ধ্যার পর হরিনাম শোনার পালা। হরির পবিত্র নাম শোনার মধ্যেও পুণ্য। হরিশংকরের পুণ্য সংগ্রহ চলতেই থাকে। তবে তিনি শারীরিকভাবে খানিকটা অচল হয়ে পড়েছেন। বাঁ পায়ে কী-যেন হয়েছে। জায়গায় জায়গায় কালো হয়ে ফুলেছে। ব্যথা-বেদনা নেই, তবে স্পর্শানুভূতিও নেই। শুধু মাটিতে পা ফেললে যন্ত্রণায় অস্থির হন।

কুষ্ঠরোগের প্রধান লক্ষণ স্পর্শানুভূতি চলে যাওয়া। তার মতো পুণ্যবান মানুষের কুষ্ঠরোগ হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

কাশির পথে পথে কুষ্ঠরোগীরা ছালা গায়ে বসে থাকে। তাদের সামনে থাকে ভিক্ষাপাত্র। কুষ্ঠরোগীদের কারোর কারোর হাত এবং পায়ের আঙুল পচে গলে হাড় বের হয়ে পড়েছে। সেখানে মাছি ভনভন করে। এই দৃশ্য হরিশংকরের সহ্য হয় না। তিনি নিয়মিত কাকভোজন করালেও কুষ্ঠরোগীদের প্রতি কোনো দয়া দেখান না। কুষ্ঠরোগীরা অভিশপ্ত। তাদের দয়া করলে পুণ্য অর্জন হয় না।

আজ শনিবার, অমাবস্যা। কালীপূজার যোগ পড়েছে। হরিশংকর সকাল সকাল ঘরে ফিরেছেন। কালীপূজার রাত শাক্তদের। অন্যরা এই সময় গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে না, এটাই বিধি।

দরজা খুলে হরিশংকর হতভম্ব। আকিকা বেগম খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আকিকা বেগমের পাশে তার বান্ধবী অম্বা। দুজনের মুখ হাসি হাসি। অম্বা পরিচিতজনের মতো করে বলল, কেমন আছেন?

হরিশংকর মনে মনে রাম নাম জপ করতে লাগলেন। প্রশ্নের জবাব দিলেন না। প্রেতযোনির প্রশ্নের জবাব দিতে নেই। জবাব দিলে তারা পেয়ে বসে। অম্বা বলল, আপনার পায়ে কী হয়েছে? কুষ্ঠ?

হরিশংকর বললেন, কুষ্ঠ কেন হবে। বাত হয়েছে বাত। অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে। আজ অমাবস্যা। বাতের প্রকোপের এই কারণেই বৃদ্ধি।

প্রেতযোনির সঙ্গে কথাবার্তায় জড়াতে নেই—এই সত্য জেনেও হরিশংকর কথাবার্তা শুরু করেছেন। তিনি আবারও রাম নামে ফিরে গেলেন।

আকিকা বেগম বলল, আমার বাবা দিল্লীর সম্রাট পাদশাহ হুমায়ূন কোথায়?

আমি জানি না।

আকিকা বলল, আপনি কেন জানেন না ?

হরিশংকর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

হুমায়ূন আছেন যোধপুর রাজ্যের সীমানার একটি পরিত্যক্ত গ্রামে। গ্রামের নাম ভকুর। সেইসময় মাঝে মাঝেই কিছু জনপদ পরিত্যক্ত হতো। ডাকাতের আক্রমণ, পাশের কোনো রাজ্যের রসদ সংগ্রহ অভিযানের কারণে এটা ঘটত। মহামারি তো আছেই। মহামারীতে জনপদের পর জনপদ উজাড় হওয়ার মতো ঘটনা নিয়মিতই ঘটত।

হামিদা বানু একটি মাটির ঘরের বারান্দায় দেয়ালে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। একটু দূরে মশাল জ্বালানো হয়েছে। মশাল ঘিরে পোকা নাচানাচি করছে। তাদের কেউ কেউ সরাসরি আগুনে ঢুকে পড়ায় পট পট শব্দ হচ্ছে। হামিদা বানু পোকাদের খেলা দেখছেন।

রাতের খাবার হিসেবে লবণ দিয়ে গম সিদ্ধ করা হচ্ছে। ভগ্নহৃদয় হুমায়ূন অন্য আরেকটি ঘরের বারান্দায় আফিম খাচ্ছেন। তাঁর সৈন্যদের বেশির ভাগ তাঁকে ছেড়ে গেছে। বৈরাম খাঁ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ তাদের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য হুমায়ূনের নেই। আমীরদের মধ্যে পাঁচজন এখনো আছেন।

হুমায়ূন দূর থেকে লক্ষ করলেন, হামিদা বানু কী যেন খাচ্ছেন। বেশ আরাম করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া। হামিদা বানুর সঙ্গে কোনো খাবার নেই। কৌতূহলী হয়ে হুমায়ূন এগিয়ে গেলেন।

কী খাচ্ছ ?

হামিদা বানু লজ্জিত গলায় বললেন, খুব বেদানা খেতে ইচ্ছা করছিল তাই বেদানা খাচ্ছি।

বেদানা কোথায় পেলে ?

কোথাও পাই নি। কল্পনায় খাচ্ছি।

হুমায়ূন দুঃখিত হয়ে লক্ষ করলেন, হামিদা বানু কল্পনার বেদানা ভেঙে দানা মুখে দেওয়ার ভঙ্গি করছেন। দানা কিছুক্ষণ চিবানোর পর থু করে বিচি দূরে ফেলে দিচ্ছেন।

হামিদা বানু বললেন, জাহাঁপনা, বেদানা খুব মিষ্টি। কয়েকটা দানা খেয়ে দেখবেন ?

হুমায়ূন বললেন, এই ছেলেখেলার কোনো মানে হয় ?

হামিদা বানু বললেন, ছেলেখেলা ছাড়া আমাদের এখন কী আর আছে ?

হুমায়ূন মাথা নিচু করে স্ত্রীর সামনে থেকে বের হয়ে এলেন। তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। সম্রাট হুমায়ূনের সব জীবনীকার এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজলের গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে। ঘটনাটা এ রকম—

হুমায়ূন স্ত্রীর সামনে থেকে বের হয়ে কিছুদূর এগুতেই অপরিচিত এক লোক তাঁকে কুর্নিশ করল। হুমায়ূন বললেন, আপনি কে ?

সে বলল, আমি দুর্ভাগ্যতাড়িত এক ব্যবসায়ী। ডাকাতরা আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে। এখানে আগুন জ্বলছে দেখে এসেছি। আমি তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত।

হুমায়ূন বললেন, আমি আপনার চেয়ে খুব ভালো অবস্থায় নেই। তৃষ্ণা নিবারণ করুন। খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করুন।

বণিক বলল, আমার কাছে কিছুই নেই যা দিয়ে একজন সম্রাটকে সম্মান জানানো যায়। আমার সঙ্গে বড় একটা বেদানা আছে। যদি গ্রহণ করেন।

বণিক থলে থেকে বিশালাকৃতির একটা বেদানা বের করল। পেকে লাল টুকটুক করছে।

হামিদা বানু হাতে বেদানা পেয়ে অবাক হয়ে বললেন, বেদানা কোথায় পেলেন ?

হুমায়ূন বললেন, আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট। আমার স্ত্রীর বেদানা খেতে ইচ্ছা করছে। আমি সামান্য একটা বেদানা জোগাড় করতে পারব না ?

যোধপুরের রাজা মালদেবের কাছে শের শাহ্-পুত্র জালাল খাঁ একটি গোপন পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রের বিষয় একসময়কার দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূন। জালাল খাঁ লিখেছেন—

> যোধপুরকে আমরা আমাদের বন্ধু রাজ্য বলে গণ্য করি। বন্ধুত্ব কখনো এক পক্ষীয় বিষয় না। আপনি আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছেন তা জানা প্রয়োজন।
>
> আমাদের শক্তি সামর্থ্যের প্রমাণ আপনার চোখের সামনেই আছে। একসময়কার ক্ষমতাধর মোঘল সম্রাট আজ প্রাণভয়ে পথে-প্রান্তরে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
>
> আমরা আশা করি, আপনি যেভাবেই হোক পলাতক হুমায়ূনকে খুঁজে বের করবেন। আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসবেন। তার কাছে মহামূল্যবান হীরক কোহিনুর আছে। আপনি এই হীরকখণ্ড রেখে দেবেন। রত্নের উপর আমার পিতা বা আমার কোনো মোহ নেই। আমরা হুমায়ূনকে জীবিত অবস্থায় চাই।
>
> আপনাকে যা জানানোর আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানালাম। আপনি কী করবেন তা আপনার বিবেচ্য।

আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, হুমায়ূনের
সব ভাইরা আমাদের সঙ্গে আছে।

ইতি
জালাল খাঁ

মীর্জা কামরানের কাছে তার বোন গুলবদন বেগম এসেছে। তার হাতে কারুকার্যময় রুপার থালায় মিষ্টান্ন। গুলবদন বলল, ভাই মিষ্টি খাও।

মীর্জা কামরান বললেন, মিষ্টি খাওয়ার মতো বিশেষ কোনো ঘটনা কি ঘটেছে?

গুলবদন বলল, রাজপুরুষদের মিষ্টান্ন খেতে বিশেষ কোনো ঘটনার প্রয়োজন পড়ে না। তারপরেও ছোট্ট একটা উপলক্ষ আছে।

উপলক্ষটা কী?

আমি ভাই হুমায়ূনের মঙ্গল কামনা করে কোরান খতম এবং দোয়ায় ইউনূস খতম দিয়েছি। এই মিষ্টান্ন আমার নিজের হাতে বানানো।

মীর্জা কামরান বললেন, দোয়া দরুদে কি ভাগ্য পরিবর্তন হয়? তোমার আদরের ভাইয়ের জন্যে অনেকেই প্রার্থনা করছে। তার মধ্যে আমার নিজের মা'ও আছেন। ওনার ভাগ্য কি বদলেছে?

আল্লাহ্‌পাক যখন চাইবেন তখন ভাগ্য বদলাবে, তার আগে না। তারপরেও আমরা প্রার্থনা করি নিজেদের মনের শান্তির জন্যে।

তোমার বানানো মিষ্টান্নের একটি খেলে যদি তোমার মন শান্ত হয় তাহলে আমি মিষ্টি অবশ্যই খাব।

মীর্জা কামরান মিষ্টি মুখে দিতে-দিতে বললেন, তোমার আদরের ভাইয়ের বর্তমান অবস্থা জানতে চাও?

চাই।

সে সম্পূর্ণ আশাহত। সে মক্কা শরীফে চলে যেতে চাইছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভালো। শেষ বয়সে মক্কা শরীফে সন্ন্যাস জীবন।

আপনাকে এই খবর কে দিল ?

তাঁর দলত্যাগী আমীরদের একজন আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

গুলবদন বলল, আমি আমার ভাইকে একটি চিঠি লিখেছি। কোনোভাবে কি এই চিঠি তাঁর কাছে পৌছানো সম্ভব ?

না।

আপনার নিজের হাতেও তো তিনি ধরা পড়তে পারেন, তখন কি তাঁকে পত্রটা দেওয়া যায় না ?

মীর্জা কামরান জবাব দিলেন না। গুলবদন বলল, ওনাকে ধরার জন্যে আপনি অভিযানে যাচ্ছেন এই খবর আমি জানি। চিঠিটা এনে দিই, সঙ্গে রাখুন।

চিঠিতে কী লেখা ?

খোলা চিঠি। আপনি ইচ্ছা করলে পড়ে দেখতে পারেন। বোন ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছে। আনব ?

মীর্জা কামরান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হুমায়ূনকে লেখা গুলবদনের পত্র

> আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, আমার নয়নের নয়ন ভাই হিন্দুস্থানের সম্রাট পাদশাহ হুমায়ূন।
>
> ভাই, আপনার এই বোন আপনার জন্যে সারাক্ষণ প্রার্থনা করে যাচ্ছে। তার দিবস এবং রজনী আপনার করুণা কামনায় নিবেদিত।
>
> এই চিঠি যদি আপনার হাতে না পৌছয় তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ্‌পাক আপনার প্রতি

করুণা করেন নি। আমরা সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীনে। ভাগ্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই।

প্রিয় ভাই! আপনার কোমল মুখ একবার না দেখে যদি আমার মৃত্যু হয় তা হবে আমার জন্যে সপ্ত নরকের অভিশাপ।

প্রিয় ভাই! চিঠির অনেক লেখাই আপনার কাছে অস্পষ্ট লাগবে। আমার চোখের জলের কারণে এটা ঘটেছে। এই হতভাগ্য বোনের ভাইকে দেওয়ার মতো চোখের জল ছাড়া আর কিছুই নেই।

গুলবদন

জওহর আবতাবচি, সম্রাট হুমায়ূনের ব্যক্তিগত পানিবাহক। তাঁর লেখা *তাজকিরাতুন ওয়াকিয়াত* গ্রন্থে রাজ্যহারা হুমায়ূনের সেই সময়ের কিছু করুণ চিত্র আছে।

"দ্বিপ্রহরে যাত্রা শুরু হলো। সেদিনের অবশিষ্ট দুই প্রহর, রাত্রির চার প্রহর এবং পরদিনের তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত কাফেলাকে অব্যাহতভাবে চলতে হলো। পথিমধ্যে কোথাও পানি পাওয়া গেল না। পানির অভাবে দলের লোকজন মৃতকল্প হয়ে পড়ল। দিনের মাত্র এক প্রহর অবশিষ্ট ছিল। লোকেরা হয়রান পেরেশান হয়ে চারদিকে পানির খোঁজ করতে লাগল। এই সময় একটি মরুদ্বীপ নজরে পড়ল। সেখানে পানিভর্তি একটি জলাশয় দেখা গেল।"

পানির অভাবে সেদিন অনেকেই মারা গিয়েছিলেন। জওহর আবতাবচির গ্রন্থে জানা যায় তাদেরকে সেখানেই দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্যামব্রিজ হিস্টরি অব ইন্ডিয়া বইটিতে লেখা হয়েছে—"মরুপথের এ সফরে পানির অভাবে সম্রাটের দলের বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

মরুভূমির তীব্র দাবদাহ। বাতাসের সঙ্গে আগুন ছুটছে এমন অবস্থা। হামিদা বানু খেজুরগাছের নিচে বসে আছেন। খেজুরগাছ ছায়াদায়িনী বৃক্ষ না। রোদে হামিদা বানুর শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তাঁর ইচ্ছা করছে হাম্মামখানার শীতল জলে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকতে। যেখানে খাওয়ার পানি নেই, সেখানে হাম্মামে স্নানের চিন্তার বিলাসিতার অর্থ হয় না। হামিদা বানু নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছেন।

একটু দূরে হুমায়ূনের লোকজন বালি সরিয়ে মরুকূপের সন্ধান করছে। আজ দিনের মতো পানি আছে। রাতে পানি লাগবে। কোথায় পাওয়া যাবে পানি ?

হুমায়ূন কিছুক্ষণ কূপের বালি সরানো দেখলেন। কূপের বালি এখন ভেজা ভেজা। এর অর্থ হয়তো পানি পাওয়া যাবে। স্ত্রীকে এই আনন্দসংবাদ দেওয়ার জন্য হুমায়ূন হামিদা বানুর কাছে গেলেন। তিনি কিছু বলার আগেই হামিদা বানু বললেন, একদিন আমার খুব বেদানা খেতে ইচ্ছা করছিল। আপনি বেদানার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ আমার দুটা ইচ্ছা। আপনি আমার ইচ্ছা পূরণ করুন।

হুমায়ূন চিন্তিত গলায় বললেন, কী কী ইচ্ছা ?

হামিদা বানু বললেন, প্রথম ইচ্ছা আমি স্নান করব। কতদিন গায়ে পানি দিই না। শরীর থেকে বিষাক্ত দুর্গন্ধ আসছে। দ্বিতীয় ইচ্ছা, আস্ত একটা তরমুজ আমি একা হাম্‌ হাম্‌ করে খাব। এই দুটা ইচ্ছা পূরণ করতে না পারলে তৃতীয় ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

তৃতীয় ইচ্ছাটা কী ?

তৃতীয় ইচ্ছা হচ্ছে, আপনি আমার পাশে হাত ধরে বসে থাকবেন। রোদে দাঁড়িয়ে কূপের বালি তোলায় তদারকির কিছু নেই।

হুমায়ূন স্ত্রীর পাশে বসেছেন, তখনই খবর এল যোধপুরের রাজা মালদেব দূত পাঠিয়েছেন। দূত সঙ্গে উপহার নিয়ে এসেছেন। উপহারের মধ্যে আছে ত্রিশ মশক সুপেয় পানি, হুমায়ূনের পছন্দের ফল তরমুজ এবং হামিদা বানুর সেবার জন্য একজন বাঁদি যে সন্তানপ্রসবের জটিল বিষয়টিতেও অভিজ্ঞ।

হুমায়ূন চার মশক পানি হামিদা বানুর স্নানের জন্যে বরাদ্দ করলেন। তরমুজ আলাদা করা হলো। স্নান শেষে হামিদা বানুকে তরমুজ দেওয়া হবে।

মালদেবের দূত হুমায়ূনকে কুর্নিশ করে বললেন, রাজা মালদেব তাঁর রাজ্যে আপনাকে নিমন্ত্রণ করছেন। আপনি যতদিন ইচ্ছা মালদেবের আতিথ্য গ্রহণ করবেন। শের শাহ্‌'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে আপনাকে সবরকম সামরিক সাহায্য দেওয়া হবে।

হুমায়ূনের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি মালদেবের দূতকে জানালেন, আজ দিনের মধ্যেই তিনি রওনা হবেন।

দূত বলল, আপনার আগমনের সুসংবাদ আমি রাজা মালদেবকে জানাতে এক্ষুনি রওনা হব। আপনার স্ত্রী অসুস্থ। আপনি ধীরেসুস্থে আসুন।

হুমায়ূন দূতকে উপহার দিলেন রত্নবসানো একটি খঞ্জর।

হামিদা বানুর সেবার জন্যে যে বাঁদি পাঠানো হয়েছে তার নাম মিশা। রুক্ষ কঠিন চেহারা। চোখে মায়ার লেশমাত্র নেই।

মালদেবের দূতের প্রস্থানের পরপরই মিশা হামিদা বানুকে বলল, আপনি আপনার স্বামীকে বলুন তিনি যেন কিছুতেই মালদেবের কাছে

না যান। সেখানে শের শাহ্‌'র লোকজন বসে আছেন। আমাদের উচিত এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অমরকোটের দিকে রওনা হওয়া। অমরকোটের রাজার বয়স অল্প এবং তিনি দয়ালু।

হামিদা বানু বললেন, তুমি মালদেবের পাঠানো বাঁদি। তুমি তাকে সাহায্য করবে। আমাদের সাহায্য করতে চাচ্ছ কেন ?

মিশা বলল, আমি রাজপুত নারী। সম্রাট হুমায়ূন রাজপুত রানী কর্ণাবতীর জন্যে কী করেছিলেন সেই গল্প জানি। আমি একজন বীরের পক্ষ নেব নাকি কুচক্রী কাপুরুষ মালদেবের পক্ষ নেব ?

হামিদা বানু বললেন, আমি স্নান করব। তরমুজ খাব। তারপর রওনা হব।

মিশা বলল, না। আমাদের হাতে সময় নেই।

হুমায়ূন অমরকোটে এসেছেন শুনে অমরকোটের রাজা নিজে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। রাজকীয় পন্থায় কুর্নিশ করতে-করতে বললেন, আমার পিতা জীবিত থাকলে তিনি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যেতেন। তিনি গত বছর যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

হুমায়ূন বললেন, আপনি হোসেনের পুত্র ? আপনার পিতার মৃত্যুসংবাদে আমি ব্যথিত হলাম।

আমি ব্যথিত হচ্ছি আপনার দৈন্যদশা দেখে।

হুমায়ূন বললেন, আমাকে দেখে কেউ ব্যথিত হলে আমি নিতে পারি। কেউ করুণা দেখালে সেটা নিতে পারি না।

আপনাকে করুণা করার স্পর্ধা আমার নেই। আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বলছি। আপনার স্ত্রীর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত আপনি অমরকোটে থাকবেন। আমার পক্ষে সম্ভব সব সুযোগ-সুবিধা আপনি পাবেন।

হুমায়ূন বললেন, আমার প্রতি আপনার এই বদান্যতার কারণ জানতে পারি ?

রাজা বললেন, আমি যা করছি আমার বাবা বেঁচে থাকলে তা-ই করতেন। বাহাদুর শাহ্'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় আমার বাবা আপনার সঙ্গে ছিলেন।

হুমায়ূন বললেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পরম করুণাময়ের করুণাধারা আপনার ওপর বর্ষিত হোক—এই শুভ কামনা।

অমরকোটের হাম্মামখানায় হামিদা বানু গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে বসে আছেন। মিশা তার গা ডলে দিচ্ছে। হাম্মামঘরেই কাটা তরমুজ রাখা আছে। হামিদা বানুর দৃষ্টি সেদিকে যতবার যাচ্ছে ততবারই তার চোখ ভিজে উঠছে। তাঁর পেটের সন্তান খুব নড়াচড়া করছে। অকরুণ এই পৃথিবীতে আসার জন্যে সে ব্যস্ত হয়েছে। তার জন্যে কী অপেক্ষা করছে কে জানে!

১৫ অক্টোবর ১৫৪২ সালে এই অমরকোটেই হামিদা বানু একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় আকবর। পৃথিবীর ইতিহাসে এই আকবর তার স্থান করে নেন 'আকবর দ্য গ্রেট' হিসেবে। (আকবরের জন্মের তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। আবুল ফজলের দেওয়া তারিখের সঙ্গে জওহর আবতাবচির তারিখের অমিল আছে। জওহর আকবরের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন। তার দেওয়া তারিখ সঠিক হওয়ার কথা। বলা হয়ে থাকে জাদুটোনার হাত থেকে রক্ষার জন্যে আকবরের আসল জন্মক্ষণ গোপন রাখা হয়েছে। হুমায়ূন জাদুটোনায় প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন।)

পুত্রসন্তানের জন্মসংবাদ হুমায়ূনকে দেন জওহর আবতাবচি। হুমায়ূন আবতাবচিকে বলেন, তোমার কাছে আমি যে মৃগনাভিটি গচ্ছিত রেখেছি সেটা নিয়ে আসো, আর একটা ছুরি আনো।

জওহর আদেশ পালন করলেন। হুমায়ূন নিজের হাতে মৃগনাভি ভাগ করে তার সঙ্গী আমীরদের হাতে দিয়ে বললেন, আজ আমার চরম

দুঃসময়। আমি পুত্রের জন্মের আনন্দ করব, আপনাদের সবাইকে উপহার দেব, সে সামর্থ্য আমার নেই। মৃগনাভির একটি করে টুকরা আপনাদের দিলাম। আপনারা প্রার্থনা করুন যেন আমার পুত্রের যশ মৃগনাভির সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

কান্দাহার দুর্গে মীর্জা হিন্দালকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। কামরানের হঠাৎ ধারণা হয়েছে তার এই ভাই হুমায়ূনের প্রতি অনুগত। সুযোগ পেলেই সে হুমায়ূনের সঙ্গে যোগ দেবে। হিন্দালকে ভয় দেখানোর জন্যে কামরান চারজন সাধারণ প্রজাকে ধরে এনে ঘোষণা করলেন, এরা হুমায়ূনের প্রতি অনুরক্ত। শাস্তি হিসেবে এদের চোখ উৎপাটন করা হবে। চোখ উৎপাটনের এই কাজটা করব আমি নিজে।

তা-ই করা হলো। এই চারজনের বিকট চিৎকার যেন মীর্জা হিন্দাল শুনতে পারেন সেই ব্যবস্থাও করা হলো।

চোখ উৎপাটিত চারজনকে রাখা হলো মীর্জা হিন্দালের আশপাশে।

কামরান মীর্জা আসকারিকে পাঠালেন হুমায়ূনকে ধরে আনার জন্যে।

জানুয়ারি মাসের শুরু।

শিশুপুত্র এবং সঙ্গীদের নিয়ে হুমায়ূন আবার পথে নেমেছেন। খবর পেয়েছেন জালাল খাঁ নিজে তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। পথে নামা ছাড়া উপায় কী ? প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে হামিদা বানু স্বামীর পাশে পাশে যাচ্ছেন। পশ্চিম দিক থেকে বাতাসের ঝাপ্টা আসছে। ঘোড়া সেদিকেই যাচ্ছে। হামিদা বানু বললেন, আমি জানতে চাই আমি কোথায় যাচ্ছি ?

হুমায়ূন জবাব দিলেন না, কারণ তাঁর কাছে জবাব নেই। তিনি নিজেও জানেন না কোথায় যাচ্ছেন।

হামিদা বানু বললেন, আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে আমার ছেলে শীতে জমে যাবে।

হুমায়ূন যাত্রাবিরতির আদেশ দিলেন। অমরকোটের রাজা উপহার হিসেবে ভেড়ার চামড়া জোড়া দিয়ে তৈরি একটি তাঁবু হামিদা বানুকে দিয়েছেন। প্রচণ্ড শীতেও এই তাঁবুর ভেতরটা উষ্ণ থাকে।

তাঁবু খাটানো হয়েছে। শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে হামিদা বানু তাঁবুর ভেতর ঢুকেছেন। তাঁবুর সামনে আগুন করা হয়েছে। হুমায়ূন আগুনে হাত-পা গরম করার চেষ্টা করছেন। শীতে কাহিল অচেনা একটা পাখি আগুনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। মানুষের ভয়ে সে এখন আর ভীত না। হুমায়ূন অনেকখানি সরে পাখিকে জায়গা করে দিলেন। তখনই খবর এল হুমায়ূনের ভাই মীর্জা আসকারি বিশাল বাহিনী নিয়ে হুমায়ূনকে ধরে নিয়ে যেতে আসছেন।

হুমায়ূন হামিদা বানুকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁবুর ভেতর আছে শিশু আকবর এবং ধাই মিশা। তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছে জওহর আবতাবচি। হুমায়ূন জওহর আবতাবচিকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সে যেন নিজের হাতে শিশু আকবরকে মীর্জা আসকারির হাতে তুলে দেয় এবং শিশুর জীবন ভিক্ষা চায়।

মীর্জা আসকারি তাঁবুর সামনে উপস্থিত। তাঁবুর ভেতর থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ আসছে। তাঁবুর সামনে মাথা নিচু করে জওহর আবতাবচি দাঁড়িয়ে আছে। আসকারি বললেন, তাঁবুর ভেতরে কে?

জওহর বলল, মহান সম্রাট হুমায়ূনের পুত্র শাহজাদা আকবর।

হুমায়ূন কোথায়?

আমি জানি না জনাব।

কোনদিকে গেছেন এটা নিশ্চয়ই জানো?

হ্যাঁ জানি, কিন্তু আপনাকে বলব না।

শিশুকে নিয়ে আসো।

জনাব আমি নিজের প্রাণের বিনিময়ে এই শিশুর জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি।

তোমাকে বলছি শিশুটিকে নিয়ে আসতে। হুকুম পালন করো।

জওহর শিশু আকবরকে কোলে করে নিয়ে এল।

আসকারি শিশুকে নিয়ে কান্দাহার চলে গেলেন।

কান্দাহার দুর্গে সুন্দর একটি নাটক অভিনীত হলো। আসকারি তাঁর স্ত্রীকে (ইনালা বেগম) ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এই শিশুটির নাম আকবর। তার বাবা-মা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছেন। এই শিশুটির সব দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। সে যেন বাবা-মা'র অভাব কোনোদিন বুঝতে না পারে।

ইনাহা বেগম পরম মমতায় শিশু আকবরকে কোলে তুলে নিলেন।

আচার্য হরিশংকর মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর বাঁ পায়ের মাংস খুলে খুলে পড়তে শুরু করেছে। তিনি ভীত চোখে একবার তাকাচ্ছেন পায়ের দিকে একবার তাকাচ্ছেন খাটে বসা আকিকা বেগমের দিকে। আজ সে একা এসেছে। তার বান্ধবী অম্বা আসে নি। সে সব দিন আসে না।

আকিকা বেগম বলল, আপনার কুষ্ঠ হয়েছে?

না। বাত রোগ। খারাপ বাত রোগে এ রকম হয়।

বাত রোগ না, আপনার কুষ্ঠ হয়েছে। এর চিকিৎসা আমি জানি।

কী চিকিৎসা?

পা আগুনে পুড়ানো। বড় করে আগুন করুন। সেই আগুনে আপনার পা ঢুকিয়ে দিন।

চুপ।

আমাকে ধমকাবেন না। আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হুমায়ূনের মেয়ে। এখন বলুন আমার বাবা কোথায়?

আমি জানি না।

কেন জানেন না?

হরিশংকর ঘর থেকে বের হলেন। গঙ্গার তীরে কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। ডান পা গঙ্গার পানিতে ডুবিয়ে রাখবেন। যে পবিত্র গঙ্গা স্পর্শ করে থাকে, তার কাছে প্রেতযোনি আসতে পারে না।

হরিশংকর গঙ্গায় ডান পা ডুবিয়ে ঘাটে বসে আছেন। গঙ্গার পানি গরম, কিন্তু তার গায়ের ওপর দিয়ে হিমশীতল বাতাস বইছে। তিনি একমনে শব্দ করে রাম নাম আবৃত্তি করছেন। প্রেতযোনি রাম নামে ভীত হয়।

আমার বাবা সম্রাট হুমায়ূন কোথায়?

হরিশংকর চমকে তাকালেন। তাঁর পেছনেই আকিকা বেগম। আকিকা বেগমের হাত ধরে আছে অম্বা। দু'জনের মুখই হাসি হাসি।

হুমায়ূন তুষারঝড়ে পড়েছেন। ঘোড়া চলতে পারছে না। চারটা ঘোড়াকে গোল করে দাঁড় করিয়ে হুমায়ূন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘন হয়ে তুষার পড়ছে। এক হাত দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ হুমায়ূনকে চমকে দিয়ে হামিদা বানু শব্দ করে হেসে ফেললেন।

হুমায়ূন বললেন, হাসছ কেন?

আমার ছেলেটা তাঁবুর ভেতর গরমে আরাম করে আছে এই ভেবে শান্তি লাগছে। শান্তির আনন্দেই হাসছি। এখন আমাকে একটা শের শোনান। শের শুনতে ইচ্ছা করছে।

তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ ?

শের না শুনলে পাগল হয়ে যাব।

কাছেই কোথায় যেন আগুন জ্বলছে। এটা কি চোখের কোনো ভুল ? মানুষ মরীচিকা দেখতে অভ্যস্ত। মরুভূমিতে পানির অভাব হলে চোখের সামনে নকল পানি দেখা যায়। শীতে পর্যুদস্ত হয়েছেন বলেই কি নকল আগুন!

জাহাঁপনা!

কে ?

আমি বৈরাম। জঙ্গলের ভেতর একটা ঘর পাওয়া গেছে। আমি আগুন জ্বালিয়েছি। আপনারা আসুন। খুব সাবধান। বরফ জমে সব পিচ্ছিল হয়ে আছে।

হুমায়ূন স্ত্রীর হাত ধরে এগুচ্ছেন। যত দ্রুত সম্ভব আগুনের পাশে দাঁড়াতে হবে। ঝড়ের গতি আরও বাড়ছে।

হুমায়ূন হতাশ গলায় বললেন, হামিদা বানু, আমি এই জীবন আর টানতে পারছি না। সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব ছেড়েছুড়ে পবিত্র মক্কা শরীফে চলে যাব।

হামিদা বানু বললেন, পরাজিত মানুষের মতো কথা বলছেন ?

আমি তো পরাজিত মানুষই। পারস্যের ভেতর দিয়ে আমি মক্কা চলে যাব। আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমি একা যাব। বৈরাম খাঁ।

জাহাঁপনা, আমি আপনার কথা শুনছি।

পারস্য-সম্রাট কি তাঁর রাজ্যের ভেতর দিয়ে আমাকে মক্কা যেতে দেবেন ?

অবশ্যই দেবেন। তবে এই চিন্তা আপাতত বন্ধ রাখুন। আসুন আগুনের পাশে যাই।

পারস্য-সম্রাট শাহ তামাস্প এবং রাজ্যহারা হুমায়ূন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। পারস্য-সম্রাট তাঁর জাঁকজমক দেখিয়ে হুমায়ূনকে অভিভূত করতে চাইছেন। অপূর্ব বেশভূষায় সজ্জিত খোজারা পুষ্পবৃষ্টি করল। সামরিক বাদ্যবাজনা হচ্ছে। ঘোড়সওয়ার বাহিনী সালাম জানিয়েছে। এগিয়ে আসছে হস্তীবাহিনী। চারদিকের হইচইয়ের মধ্যে হুমায়ূনকে দীনহীন দেখাচ্ছে।

শাহ তামাস্প বললেন, তৈমুরের বংশধর সম্রাট বাবরের পুত্র হিন্দুস্থানের অধিপতির এই দশা কেন ?

হুমায়ূন বললেন, আমার ভাইদের কারণে এই দশা।

সিংহাসনে বসেই ভাইদের হত্যা করলেন না কেন ?

সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না।

শাহ তামাস্প বললেন, সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না বলেই কেউ সম্রাট, কেউ পথের ভিক্ষুক। আপনি আমার কাছে কী চান ?

হুমায়ূন বললেন, আমি আপনার করুণা চাই না। আমি শুধু পারস্যের ভেতর দিয়ে মক্কা চলে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি।

আমি যতদূর জানি আপনি সুন্নী মতাবলম্বী।

ঠিকই জানেন। আমার স্ত্রী হামিদা বানু শিয়া।

আপনার স্ত্রী চাইলেই মক্কা যেতে পারবেন। আপনাকে মক্কা যেতে হলে শিয়া মতাবলম্বী হতে হবে। আপনি হয়তো জানেন না, আমি

পারস্য সুন্নিমুক্ত করার পরিকল্পনা করেছি। যেসব সুন্নি শিয়া-মতবাদ গ্রহণ করছে না তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

হুমায়ূন বললেন, আমাদের নবিজি (দঃ) বিদায় হজের ভাষণে ধর্মবিষয়ে সহনশীল হতে বলেছেন।

তামাস্প বললেন, এই ধরনের কোনো কথা হযরত আলী বলেন নি। আমরা শিয়ারা হযরত আলীর মতামতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যাই হোক, এখন আমি ধর্মবিষয়ে আলোচনায় উৎসাহী না। পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত। ক্লান্তি দূর করুন। সন্ধ্যাবেলা আপনার সম্মানে রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। আপনার শিয়া-মতবাদ গ্রহণ বিষয়ের আলোচনা তখন হবে। আপনার পরিধেয় বস্ত্রের যে অবস্থা তা পরে রাজকীয় ভোজসভায় যেতে পারবেন না। আপনার জন্যে পোশাক সরবরাহ করা হবে।

হুমায়ূন বিষণ্ন মনে তাঁর জন্যে খাটানো তাঁবুতে ঢুকলেন। হামিদা বানুর জন্যে আলাদা তাঁবু খাটানো হয়েছে। তামাস্প'র হেরেমের নারীরা তার দেখ্‌ভাল্‌ করছে।

শাহ্‌ তামাস্প নিজের তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর সামনে দমীহ্‌ নামের পারস্যের বিখ্যাত সুরা। মাঝে মাঝে তিনি সুরার পাত্রে চুমুক দিচ্ছেন। বৈরাম খাঁকে ডেকে আনা হয়েছে। বৈরাম খাঁ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে বসার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

আপনি হুমায়ূনের প্রধান সেনাপতি ?

জি আলামপনা।

আপনাকে দেখে প্রধান সেনাপতি মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আপনি মেষপালক।

আপনার কথায় সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের নবিদের সবাই কোনো-না-কোনো পর্যায়ে মেষপালক ছিলেন।

আপনি শিয়া মতাবলম্বী ?

জি জাহাঁপনা।

আপনার মাথায় শিয়াদের লম্বা টুপি নেই কেন ? মাথার চুলও তো শিয়াদের মতো কাটা না। রাজকীয় ভোজসভায় আপনি উপস্থিত থাকবেন, তখন যেন মাথায় শিয়াদের টুপি থাকে।

বৈরাম খাঁ বললেন, এই কাজটা আমি মহান সম্রাট হুমায়ূনের অনুমতি ছাড়া করতে পারব না।

তামাস্প কঠিন গলায় বললেন, আপনার মহান সম্রাট হুমায়ূন নিজেই শিয়া টুপি পরে ভোজসভায় আসবেন। তাঁকে পরিধেয় বস্ত্রের সঙ্গে এই টুপিও পাঠানো হয়েছে।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমার সম্রাট ভোজসভাতে যদি মাথা ন্যাড়া করে আসেন, আমি মাথা ন্যাড়া করেই যাব।

আপনার মতো এত অনুগত সেনাপ্রধানের কারণেই হয়তো হুমায়ূন সব কয়টি যুদ্ধে হেরেছেন। শুনেছি প্রাণে বাঁচার জন্যে হুমায়ূনকে কয়েকবার পানিতেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। তখন আপনি নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে সাঁতার কেটেছেন ?

বৈরাম খাঁ বলল, এই সৌভাগ্য আমার হয় নি।

তামাস্প হাত ইশারায় বৈরাম খাঁকে চলে যেতে বলে পানপাত্রে মনোযোগ দিলেন। তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত দেখাচ্ছে।

ভোজসভায় পারস্য সাম্রাজ্যের শানশওকত দেখানোর সব চেষ্টাই শাহ তামাস্প করেছেন।

বিশাল তাঁবুতে ভোজসভা বসেছে। চারদিক আলো ঝলমল করছে। নর্তকী এবং বাদ্যযন্ত্রীরা প্রস্তুত। সম্রাটের ইশারা পেলেই গানবাজনা শুরু হবে।

রান্না হচ্ছে দুটি আলাদা রন্ধনশালায়। একটিতে পারস্যের রান্না। অন্য রন্ধনশালায় হিন্দুস্থানি বাবুর্চি তৈরি করছে খোসকা পোলাও।

শাহ তামাস্প এবং হুমায়ূন মুখোমুখি বসেছেন। তামাস্পের সঙ্গে তাঁর আমীর এবং সেনাপতিরা। হুমায়ূনের সঙ্গে তাঁর চারজন আমীর এবং বৈরাম খাঁ। হুমায়ূন শাহের পাঠানো শিয়া টুপি পরেন নি। শাহ তাতে খুব অসন্তুষ্ট এমন মনে হচ্ছে না, বরং তাঁকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে। শাহের নির্দেশে হুমায়ূনের সামনে একটি সোনার থালা রাখা হলো। থালায় মহামূল্যবান মণিরত্ন।

শাহ বললেন, পারস্যের পক্ষ থেকে সামান্য উপহার। ভোজসভায় উপহার বিনিময়ের রেয়াজ আছে। তবে আপনার অবস্থা আমরা অনুমান করতে পারছি। আপনার কাছ থেকে উপহার হিসেবে শুভেচ্ছা পেলেই আমরা সন্তুষ্ট। শাহের উপস্থিত আমীররা এ কথায় হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। কারও কারও ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল।

হুমায়ূন বললেন, মহামান্য শাহ তামাস্পের জন্যে আমার পক্ষ থেকে সামান্য উপহার। এই উপহার গ্রহণ করলে আমি এবং আমার সঙ্গীরা আনন্দিত হব।

হুমায়ূন সবুজ রেশমি রুমালে ঢাকা একটি পাথর এগিয়ে দিলেন।

শাহ তামাস্প রুমাল খুলে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখে কোনো কথা ফুটল না। শাহের আমীররা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে নিচুস্বরে ফিসফিস শুরু হলো।

তামাস্প বললেন, এইটিই কি সেই বিখ্যাত কোহিনুর?

বৈরাম খাঁ বললেন, আলমপনা, এইটি সেই কোহিনুর যা তরবারি দিয়ে পেতে হয় অথবা ভালোবাসার উপহার হিসেবে পেতে হয়।

কোহিনুরের উপর আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে সবুজ রেশমি রুমালের মাঝখানে আগুন ধরে গেছে।

শাহ তামাস্পের নির্দেশে খাবার পরিবেশন শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে নৃত্যগীতের আসর বসেছে। সাতজন নর্তকী নাচছে। তাদের সঙ্গে বাদ্যবাজনা। বাদ্যবাজনার সুর করুণ কিন্তু নাচের ভঙ্গি উচ্ছল। দুই বিপরীত ধারা চমৎকার মিল খেয়ে গেছে।

হুমায়ূন মুগ্ধ হয়ে নাচ দেখছেন। শাহ তামাস্প বললেন, এইসব নর্তকীকে আমি উপহার হিসেবে আপনাকে দিলাম। আপনার তাঁবুর পাশেই এদের তাঁবু। আপনি ইচ্ছা করলেই নর্তকীদের ব্যবহার করতে পারেন। তবে মক্কায় গেলে এদের নিয়ে যেতে পারবেন না। হা হা হা।

শাহ নিজের রসিকতায় হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন। আমীররাও হাসছেন। সুরা তার প্রভাব বিস্তার শুরু করেছে।

নিশিরাত পর্যন্ত পান ভোজন চলল। শাহ তামাস্প পরদিন তার সঙ্গে বাঘ শিকারে যাওয়ার জন্যে হুমায়ূনকে আমন্ত্রণ জানালেন। ভোজসভায় শিয়া প্রসঙ্গ উঠল না।

মীর্জা কামরান ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। তাঁর শরীর ঘামে ভেজা। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। দুঃস্বপ্নে তিনি দেখলেন, তাঁকে ঢোকানো হয়েছে গাধার চামড়ায়। চামড়া সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ির পাটাতনে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ঘোড়ার গাড়ির চালক রুপার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বলছে, মহান মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের নির্দেশে মীর্জা কামরানকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ির পেছনে শত শত শিশু। তাদের খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মীর্জা কামরান সুরাইভর্তি পানি খেলেন। তাতেও তাঁর তৃষ্ণা মিটল না। তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখতে বসলেন। এই চিঠি যাবে পারস্য-সম্রাট শাহ তামাস্প'র কাছে।

মীর্জা কামরানের পত্র

মহান পারস্য-সম্রাট
পৃথিবীর সূর্য, জগতের সৌন্দর্য, সর্বশক্তির আধার
শাহ তামাস্প,

আমার বড়ভাই, মোঘল সাম্রাজ্যের কলঙ্ক হুমায়ূন বিষয়ক কিছু কথা।

জাহাঁপনা, আমার এই ভীরু কাপুরুষ বিচার বুদ্ধিহীন ভ্রাতার কারণে আমরা দিল্লীর সিংহাসন হারিয়েছি। হাজার হাজার সাহসী মোঘল সেনার প্রাণনাশ হয়েছে।

তাঁর কাপুরুষতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তিনি তাঁর শিশুসন্তানকে ফেলে পালিয়ে গেছেন পারস্যে। সেই শিশুসন্তানকে এখন আমরা আদর এবং মমতায় প্রতিপালন করছি।

রাজ্যশাসনে আমার এই ভ্রাতা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সবসময় আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন থাকেন বলে তাঁর জগৎ বাস্তবতার বাইরের জগৎ।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত যে, আমার এই ভ্রাতা আধাবেলার জন্যে একজন মিসকিন ভিসতিওয়ালাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এতে তিনি নিজে হাস্যস্পদ হয়েছেন, মোঘলদের ছোট করেছেন।

আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আমার এই অযোগ্য অকর্মণ্য ভ্রাতাকে আমার হাতে তুলে দিন। বিনিময়ে আমি কান্দাহার আপনার হাতে তুলে দেব।

বর্তমানে দিল্লীর শাসনভার শের শাহ্ পুত্র ইসলাম শাহ্'র হাতে। আমি নিশ্চিত আল্লাহ্পাকের হুকুমে আমি তাকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করব। অর্কমণ্য নেশাগ্রস্ত হুমায়ূন জীবিত থাকা অবস্থায় এটা সম্ভব হবে না।

এই পত্র আমি আমার তিন ভাইয়ের সম্মতিতে লিখছি। রাজমহিষীরা আমার সঙ্গে আছেন।

ইতি
মীর্জা কামরান

ফজরের নামাজের পরপরই মীর্জা কামরানের দেহরক্ষী দলের প্রধান সুলতান মুহাম্মদকে পারস্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। গোপন এই চিঠির খবর মীর্জা আসকারিও জানল না।

দুপুরে মীর্জা কামরান একটি দুঃসংবাদ পেলেন। কান্দাহার থেকে মীর্জা হিন্দাল পালিয়েছেন। তিনি হুমায়ূনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে পারস্যের দিকে যাত্রা করেছেন।

মীর্জা কামরান ফরমান জারি করলেন, যে হিন্দালকে জীবিত বা মৃত তাঁর কাছে নিয়ে আসতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মীর্জা হিন্দাল যে দুজনের সাহায্যে পালিয়েছিলেন তারাই তাঁকে ধরে এনে সন্ধ্যার মধ্যে মীর্জা কামরানের কাছে হাজির করল। তারা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কারের দাবিদার।

মীর্জা কামরান দুজনের প্রত্যেককেই পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রা দিতে খাজাঞ্চিকে হুকুম দিলেন। পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ তারা করেছে, তবে একজন শাহজাদার বিশ্বাসভঙ্গ করার মতো অপরাধও তারা

করেছে। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে দুজনের স্বর্ণমুদ্রাই বাজেয়াপ্ত হবে। একই সঙ্গে তিনি দুজনকেই অন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

হিন্দালকে পাঠানো হলো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের যেখানে রাখা হয় সেখানে। মীর্জা কামরান হিন্দালকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে হাতির পায়ের নিচে হিন্দালের মাথা চূর্ণ করে।

মীর্জা কামরান নির্দেশ দিলেন কাবুল থেকে জল্লাদ হাতি ছোট কুমারকে আনতে। মীর্জা কামরান তওবা করে হিন্দালকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন।

জল্লাদ-হাতি চলে এসেছে। বেলা দ্বিপ্রহর। শাস্তিপ্রদান অনুষ্ঠান দেখার জন্যে উৎসুক কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে। তাদের চোখে কৌতূহল এবং শঙ্কা।

হিন্দালকে হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় বিশাল প্রস্তরখণ্ডের কাছে নেওয়া হয়েছে। হিন্দাল প্রস্তরখণ্ডের ওপর মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে থাকবেন। হাতি বাঁ পা তাঁর মাথার উপর রাখবে। মৃত্যুদণ্ডে হাতির বাঁ পা ব্যবহার করা হয়।

মীর্জা কামরান হাতে লাল রুমাল নিয়ে বসে আছেন। রুমাল ফেলে দিলেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।

মাওলানা শেষবারের মতো হিন্দালকে তওবা পড়ালেন। কোরানপাকের একটি আয়াত আবৃত্তি করলেন, যার অর্থ—

"আজ তুমি যেখানে যাচ্ছ একদিন আমরাও সেখানে যাব।"

কামরান রুমাল ফেলে দিয়েছেন। হাতি তার বাঁ পা হিন্দালের মাথা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মাথা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে না।

মীর্জা কামরান বললেন, সমস্যা কী ?

হাতির মাহুত বলল, জাহাঁপনা বুঝতে পারছি না।

কামরান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যারা হত্যাকাণ্ড দেখতে এসেছে, তাদের মধ্যে ফিসফিস কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি।

হাতি ডানে বাঁয়ে খুব দুলছে। শুঁড় নাচাচ্ছে। কিন্তু মূল কাজটা করছে না। মীর্জা কামরান বললেন, বন্দিকে নিয়ে যাও।

হাতির পায়ের নিচ থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়ে যায়। এটাই নিয়ম। জনতা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিল। এর অর্থ আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ। কামরান বুঝতে পারছেন না এই ধ্বনি কি তারা হিন্দালের পক্ষে দিল? এত সাহস তাদের হওয়ার কথা না।

মীর্জা কামরান তাঁর খাস কামরায়। হাতির মাহুত তাঁর সামনে। ভয়ে সে অস্থির হয়ে আছে। কামরান কঠিন গলায় বললেন, তোমার নাম কী?

বাহাদুর।

তুমি মাহুতের কাজ কত বছর ধরে করছ?

আপনার পিতা জীবিত থাকা অবস্থাতেও আমি মাহুত ছিলাম।

হাতি পা নামায় নি কেন?

বাহাদুর বলল, এর উত্তর আল্লাহ্‌পাক জানে এবং হাতি জানে। আমি জানি না।

মীর্জা কামরান বললেন, অবশ্যই তুমি জানো। হাতি পা ফেলবে তোমার ইশারায়। সেই ইশারা তুমি দাও নাই।

মাহুত চুপ করে রইল।

নির্দেশ না দেওয়ার জন্যে তুমি কি কারও কাছ থেকে উৎকোচ নিয়েছ?

না।

হিন্দালের জীবন কেন বাঁচাতে চেয়েছ? সত্যি জবাব দাও। সত্যি জবাব দিলে তোমাকে প্রাণ ভিক্ষা দেব। মিথ্যা জবাব দিলে তোমাকে হাতির পায়ের নিচে মরতে হবে।

বাহাদুর বলল, মীর্জা হিন্দালকে সম্রাট হুমায়ূন অত্যন্ত পছন্দ করেন। ভাইয়ের করুণ মৃত্যুর খবর পেলে সম্রাট কষ্ট পাবেন ভেবেই হাতিকে নির্দেশ দিই নাই।

সত্যি কথা বলায় আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু সত্যটা শুনে অবাক হয়েছি। তুমি বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকের একটাই শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড।

কামরানের নির্দেশে বাহাদুরের মাথা হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করা হলো। জল্লাদ হাতিই কাজটা করল, তবে এবার মাহুত ভিন্ন।

হিন্দালের হাতির পায়ের নিচে থেকে বেঁচে যাওয়ার ঘটনায় কামরান বিচলিত, তবে সেই দিনই আনন্দিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটল। পারস্য-সম্রাট দূত মারফত তাঁর চিঠির জবাব পাঠালেন। সেখানে লেখা—'যথাসময়ে আপনার ভাই হুমায়ূনকে জীবিত অবস্থায় আপনার কাছে পাঠানো হবে। কান্দাহার সিংহাসনে বসবে আমার পুত্র মুরাদ।'

হুমায়ূনের ধারণা তাকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। বৈরাম খাঁ'র সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। আমীররা থাকছেন আলাদা। তিনি হামিদা বানুর কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন। তাঁকে বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন শিয়া একজন সুন্নি। পারস্য সাম্রাজ্যে তারা একত্রে থাকতে পারবেন না।

বৈরাম খাঁ'র বিষয়ে হুমায়ূন নিজেই শাহকে জিজ্ঞেস করলেন।

শাহ্ বললেন, বৈরাম খাঁকে আপনার প্রয়োজন কেন ? সে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মচারী মাত্র। তার সঙ্গে সময় কাটানোর কিছু নেই। নিঃসঙ্গ বোধ করলে আমাকে ডাকবেন। দুজনে গল্প করব। চলুন আজ লক্ষ্যভেদ খেলা খেলি।

চলুন।

শুনেছি রাজকীয় লাইব্রেরিতে আপনি প্রচুর সময় কাটান। কিছুদিন হলো গভীর মনোযোগে আপনি একটি পাণ্ডুলিপি কপি করছেন। কিসের পাণ্ডুলিপি ?

জ্যোতির্বিদ্যার।

মক্কায় জ্যোতির্বিদ্যার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আপনি কী করবেন ?

হুমায়ূন জবাব দিলেন না।

লক্ষ্যভেদ খেলায় হুমায়ূন ভালো করলেন। পাঁচটি তীরের মধ্যে তিনটি লক্ষ্য ভেদ করল। শাহ্ বললেন, আপনার মনোসংযোগ প্রক্রিয়া এখনো ঠিক আছে, এটা ভালো। আপনার অবস্থায় আমি পারতাম না। মাছ শিকারে কি আপনার আগ্রহ আছে ?

না।

শাহ বললেন, অনাগ্রহের বিষয়ও আমাদের মাঝে মাঝে করতে হয়।

তা হয়।

সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে মক্কা শরিফে যেতে ইচ্ছা করে না কিন্তু যেতে হয়। ঠিক বলছি না ?

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

শাহ বললেন, এবার আপনাকে একটি জটিল প্রশ্ন করছি। শুনেছি জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বিশেষ পারঙ্গম। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ্ কোথায় বাস করেন ?

হুমায়ূন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তিনি বাস করেন ব্যথিত মানুষের অন্তরে।

আপনি ব্যথিত মানুষ। তিনি কি আপনার অন্তরে বাস করছেন ?

হুমায়ূন জবাব দিলেন না।

শাহ্ বললেন, আমরা ভোরবেলা মাছ শিকারে যাব। শিকারপদ্ধতি আমি শিখিয়ে দেব। জটিল কিছু না। বঁড়শিতে মাছ গেঁথে তাকে খেলাতে হয়। যে যত ভালো খেলাতে পারে সে তত বড় শিকারি।

মাছধরা খেলা খুবই জমেছে। শাহ্ প্রকাণ্ড একটা মাছ ধরেছেন। আনন্দ-উত্তেজনায় তিনি ঝলমল করছেন। হুমায়ূন বললেন, মাছ শিকার একটি মনোমুগ্ধকর খেলা। দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি। শিকারির আহত হওয়ার ভয় নেই, কিন্তু শিকারের আনন্দ পুরো মাত্রায় আছে। আমি আরেক বার এই শিকারে আসতে চাই। নিজের হাতে একটা মাছ ধরতে চাই।

শাহ্ তামাস্প বললেন, সেই সুযোগ আপনি পাবেন না। আপনার ভাই মীর্জা কামরানের হাতে আপনাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় তুলে দিতে হবে। বিনিময়ে আমি পাব কান্দাহার।

হুমায়ূন চুপ করে রইলেন।

তামাস্প নির্বিকার গলায় বললেন, আপনাকে জীবিত অবস্থায় তাঁর হাতে তুলে দেওয়াটাই পারস্য-সম্রাটের জন্যে সম্মানজনক। আপনাকে হত্যা করলে লোকে বলবে আমার কছে আশ্রয়প্রাপ্ত এক রাজ্যহারা সম্রাটকে আমি হত্যা করেছি।

হামিদা বানুর সঙ্গে কি একবার দেখা করতে পারব?

অবশ্যই। হামিদা বানুও জীবিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে যাবেন। আপনার প্রিয় বৈরাম খাঁও যাবে।

হুমায়ূন বললেন, আপনি আমার একটি অনুরোধ রাখুন। আমাকে একা কামরানের হাতে তুলে দিন। আমার স্ত্রী এবং বৈরাম খাঁকে মক্কা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

শাহ তামাস্প বললেন, তা হয় না।

হুমায়ূনকে শাহ সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকে নিয়ে এলেন। পারস্য-সম্রাটের বিশাল বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় আছে।

শাহ বললেন, এই বাহিনীতে কুড়ি হাজার অত্যন্ত দক্ষ ঘোড়সওয়ার আছে। আপনি এদের সঙ্গে নিয়ে জীবিত অবস্থাতেই কান্দাহার যাবেন। কান্দাহার দখল করে আমাকে দেবেন। আমার কথা ঠিক রইল, আপনি জীবিত অবস্থায় কান্দাহার গেলেন। আমি কান্দাহার পেলাম। আপনার সঙ্গে আমার পুত্র মুরাদ যাবে। তাকে কান্দাহারের সিংহাসনে বসানোর দায়িত্ব আপনার। মোঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে আপনি আমার বাহিনী ব্যবহার করতে পারেন।

হতভম্ব হুমায়ূন তাকিয়ে আছেন। পুরো বিষয়টা বুঝতে তাঁর সময় লাগছে।

শাহ্ তামাস্প হাত বাড়িয়ে বললেন, বন্ধু বিদায়।

হুমায়ূন শাহকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত।

শাহ তামাস্প বললেন, আপনার হৃদয় কি এখনো ব্যথিত ?

হুমায়ূন বললেন, না।

শাহ্ তামাস্প হাসতে হাসতে বললেন, এটা তো দুঃসংবাদ। এখন তাহলে আল্লাহ্ আপনার হৃদয়ে অনুপস্থিত। হা হা হা।

প্রধান সেনাপতি বৈরাম খাঁ'র নেতৃত্বে পারস্য বাহিনী কান্দাহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি বিশেষ শকটে যাচ্ছেন হামিদা বানু। তাঁর কোলে পারস্য-সম্রাটের শিশুপুত্র মুরাদ, যে কান্দাহারের সিংহাসনে বসবে। শিশুপুত্রের বয়স মাত্র তিন মাস। শিশুপুত্রকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে তিনজন দুধ-মাও যাচ্ছেন।

কান্দাহার দখল হলো বিনা যুদ্ধে। কামরানের সৈন্যদের বড় অংশ হুমায়ূনের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলো। কামরান পালিয়ে কাবুল দুর্গে আশ্রয় নিলেন। মীর্জা হিন্দালকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে সেনাবাহিনীর একাংশের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

কান্দাহার দুর্গের পতনের ফলে মীর্জা কামরানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হুমায়ূনের দখলে চলে এসেছে। লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপির বিপুল সংগ্রহ দেখে হুমায়ূন মুগ্ধ। হুমায়ূন নির্দেশ জারি করলেন, এখন থেকে তিনি যেখানে যাবেন লাইব্রেরির প্রতিটি গ্রন্থ তাঁর সঙ্গে যাবে।

শিশু মুরাদকে সিংহাসনে বসিয়ে হুমায়ূন ছুটলেন কাবুলের দিকে। কাবুল দুর্গ ঘেরাও করা হলো। হুমায়ূন কামান দাগার নির্দেশ দিলেন। দুর্গকে কামানের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য মীর্জা কামরান বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করলেন। তিন বছর বয়সী আকবরকে উঁচু খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দুর্গচূড়ায় খুঁটি লাগিয়ে দেওয়া হলো। কামানের গোলা ভেতরে পড়লেই শিশু আকবর নিহত হবে। হুমায়ূনের নির্দেশে গোলাবর্ষণ বন্ধ হলো।

বৈরাম খাঁ হুমায়ূনকে বললেন, আপনি নিশ্চিত মনে তাঁবুতে অপেক্ষা করুন। আমার সঙ্গে অতি দক্ষ দুজন কামানচি আছে। এরা এমনভাবে কামান দাগবে যে, আপনার শিশুপুত্রের কোনো ক্ষতি হবে না। দ্রুত আমরা দুর্গের দখল নেব।

হুমায়ূন তাঁবুর ভেতর ঢুকে অজু করে নামাজে বসলেন। কামানের গর্জনে তাঁবু কেঁপে কেঁপে উঠছে। হুমায়ূন নামাজে মন দিতে পারছেন না। নামাজের মাঝখানেই জওহর আবতাবচি উত্তেজিত গলায় খবর দিল—জাহাঁপনা আমরা কাবুল দুর্গ দখল করেছি। বৈরাম খাঁ দুর্গে ঢুকে পড়েছেন। যুবরাজ আকবর সুস্থ আছেন। মীর্জা আসকারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিন বছর পর আকবর তার বাবা-মাকে সামনে দেখল। সে হুমায়ূনের দিকে আঙুল তুলে বলল, তুমি কে ?

হুমায়ূন বললেন, আমি কেউ না। আমি শুধু তোমার বাবা।

শিশু আকবর বলল, আমার বাবা দিল্লীর সম্রাট বাদশাহ হুমায়ূন। তুমি না।

হুমায়ূনের নির্দেশে হামিদা বানু এসে শিশুপুত্রকে কোলে তুললেন। আকবর বলল, তুমি কে ?

হামিদা বানু বললেন, আমি তোমার মা। যখন চারদিকে কামানের গোলা পড়ছিল তখন তুমি কি ভয় পাচ্ছিলে ?

হ্যাঁ।

তোমাকে আর ভয় পেতে হবে না। তোমার বাবা চলে এসেছেন।

হামিদা বানু স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, একটি ফরমান জারি করুন। লাইব্রেরির বই যেমন আপনার চোখের আড়াল হবে না, আপনার পুত্রও আপনার চোখের আড়াল হবে না।

দলে দলে সৈন্য হুমায়ূনের পক্ষে যোগ দিচ্ছে। এদের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য হুমায়ূনের নেই। সৈন্যরা বলল, এখন আমাদের কোনো বেতন দিতে হবে না। আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর বেতন দেবেন।

কামরান পালিয়ে লাহোর দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। বৈরাম খাঁ দুর্গ দখল করলেন। কামরান মেয়েদের পোশাক পরে দুর্গ থেকে পালালেন। তাঁকে চেনার কোনো উপায় নেই। তিনি চুল-দাড়ি কামিয়ে সর্বহারা সন্ন্যাসীর ভেক ধরেছেন। তিনি রওনা হয়েছেন দিল্লীর দিকে। দিল্লীর সম্রাট ইসলাম শাহ্'র কাছ থেকে যদি কোনো সাহায্য পাওয়া যায়।

কাশির রাজপথে আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছে। তরুণী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। রাস্তার পাশে বসে থাকা এক বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়াল। তরুণী বলল, আমি আপনাকে চিনি। আপনার নাম আমার মনে নেই, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।

বৃদ্ধ বলল, আমি আপনাকে চিনি না। আপনাকে চিনতেও চাচ্ছি না।

তরুণী বলল, হুমায়ূন-কন্যা আকিকা বেগম এবং তার বান্ধবী অম্বাকে কি আপনি চেনেন ?

আমি কাউকে চিনি না।

এই দুজনকে আপনি আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন।

বৃদ্ধ বলল, তুমি উন্মাদিনী। উন্মাদিনীর সঙ্গে আমি কথা বলি না।

তরুণী আমাদের পরিচিত। তার নাম আসহারি। সম্রাট হুমায়ূন তাকে 'আগ্রার বুলবুলি' উপাধি দিয়েছিলেন। চৌসার যুদ্ধে সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সাঁতরে তীরে উঠেছে। সম্রাট-কন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনার সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আসহারি অপেক্ষায় আছে কোনো একদিন সম্রাট হুমায়ূনকে ঘটনাটি জানাবে।

শের শাহ্ কাল্ডীর দুর্গ পরিদর্শনে গিয়েছেন। দুর্গপ্রাচীরের কামানগুলির অবস্থা কী দেখছেন। হঠাৎ একটি গোলাভরা কামান বিস্ফোরিত হলো। শের শাহ্ লুটিয়ে পড়লেন। মৃত্যুর আগে কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর জ্ঞান ফিরল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আমি মারা যাচ্ছি। দিল্লীর সিংহাসন আমি প্রথম পুত্র জালাল খাঁ'র জন্যে নির্ধারণ করেছি। পুত্র জালাল খাঁ সিংহের মতো সাহসী। একমাত্র সে-ই পারবে মোঘলদের হাত থেকে সিংহাসন রক্ষা করতে। আমার মন বলছে হুমায়ূন হারানো সিংহাসন পেতে ফিরে আসবেন।

জালাল খাঁ 'ইসলাম শাহ্' নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন।

ইসলাম শাহ্ কাব্যানুরাগী মানুষ ছিলেন। নিজে শের লিখতে পারতেন না, যারা পারত তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার সীমা ছিল না। মানুষ হিসেবে তাঁর অন্য গুণাবলিও ছিল। মদ্যপান বা কোনো নেশাজাতীয় বস্তুর প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না।

শের শাহ্ সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানের রাস্তাঘাট বানানোর যে কাজ শুরু করেছিলেন, ইসলাম শাহ্ সেই কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন।

দিল্লীর মানুষজন ইসলাম শাহ্‌কে পছন্দ করত।

মুণ্ডিত মস্তক শ্মশ্রুবিহীন মীর্জা কামরান দিল্লীর সম্রাট ইসলাম শাহ্'র সামনে বসে আছেন। কামরানকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ইসলাম শাহ্

রসিকতা করে বললেন, আপনাদের মহিলারাও কি আপনার মতো মাথার চুল কামিয়ে ফেলে ?

কামরান সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না। তারা আপনাদের মতো বিশাল গোঁফ রাখে।

ইসলাম শাহ্ হাসতে হাসতে বললেন, আপনার রসবোধ দেখে মুগ্ধ হলাম। আপনি চমৎকার শের লেখেন জানতাম। রসিকতা করতে পারেন জানতাম না। আপনার একটি শের শোনান।

কামরান আবৃত্তি করলেন—

গর্দিশে গরদূনে গরদ না রা দর্গ কর্দ

বর সরে আহলে তমীজা ওয়া নাকি সারা মর্দ কর্দ

(ললাটের এমনই লিখন যে সে শ্রেষ্ঠ জনকে মাটিতে মেশায়

যোগ্যদের মাথার উপর অযোগ্যদের বসায়)

ইসলাম শাহ্ গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি কি আমার প্রতি ইঙ্গিত করছেন ?

কামরান বললেন, না। রসিকতা করলাম। একটু আগে আপনি আমার রসবোধের প্রশংসা করেছেন বলেই শেরের মাধ্যমে রসিকতা। আপনি নিজে খুব ভালো করে জানেন যোগ্যরাই থাকে। অযোগ্যরা ধুলায় মিশে যায়।

ইসলাম শাহ্ বললেন, আপনি নিজেকে কী ভাবেন ? যোগ্য না অযোগ্য ?

কামরান বললেন, সময় ঠিক করে দেবে আমি যোগ্য না অযোগ্য। তবে হুমায়ূন অযোগ্য তাতে সন্দেহ নাই।

ইসলাম শাহ্ বললেন, কান্দাহার যুদ্ধে আপনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন।

আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। পারস্য-সম্রাট হুমায়ূনকে আমার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পারস্যবাহিনীকে দেখে আমি ভেবেছি তারা হুমায়ূনকে বন্দি করে নিয়ে আসছে।

কাবুলের যুদ্ধেও আপনি পরাজিত হয়েছেন।

এখানে আমার হিসাবে কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল। অতীতে দেখেছি যে-কোনো যুদ্ধে জয় লাভের পর হুমায়ূন পানাহারের উৎসব বসান। দিনের পর দিন উৎসব চলতে থাকে। আমি কল্পনাও করি নাই হুমায়ূন তৎক্ষণাৎ কাবুলের দিকে যাত্রা করবেন। আমি দুর্গ গোছানোর সময় পাই নাই।

ইসলাম শাহ্ বললেন, আমার কাছে কী চান?

ধার হিসাবে অর্থ চাই। চড়া সুদ দিতে আমি প্রস্তুত। সৈন্য সংগ্রহ করে আমি আবার কাবুল জয় করব। আমি কি অর্থ পেতে পারি?

ইসলাম শাহ্ বললেন, অবশ্যই অর্থ পেতে পারেন। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ লেগে থাকলে আমার সুবিধা। আপনারা কামড়াকামড়ি করতে থাকবেন, আমি নির্বিঘ্নে সিংহাসনে বসে থাকব।

মীর্জা কামরান আগ্রহের সঙ্গে বললেন, কী পরিমাণ অর্থ সাহায্য আমি পেতে পারি?

ইসলাম শাহ্ হাই তুলতে তুলতে বললেন, পাঁচটি তাম্র মুদ্রা দিতে পারি। এতে চলবে?

মীর্জা কামরান হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। ইসলাম শাহ্ বললেন, এতক্ষণ আপনি রসিকতা করছিলেন এখন আমি রসিকতা করলাম।

কামরান বললেন, আপনি আমাকে কোনো সাহায্য করছেন না?

ইসলাম শাহ্ বললেন, আপনি যদি সম্পূর্ণ নিজের অর্থে এবং নিজের সামর্থ্যে আবার কাবুল জয় করতে পারেন তবেই বুঝব আপনি যোগ্য। তখন সাহায্য করব। তার আগে না।

মীর্জা কামরান হনহন করে দরবার ত্যাগ করলেন। দরবারের অমাত্যরা ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, ময়ূর! ময়ূর!

কোনো এক বিচিত্র কারণে কামরানের দরবারে ঢোকা এবং বেরুবার সময় তারা 'ময়ূর', 'ময়ূর' করেন।

বৈরাম খাঁ পারস্য সেনাবাহিনীর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত। তারা শানশওকত এবং জৌলুস প্রদর্শনে যতটা উৎসাহী যুদ্ধে ততটা না। তাদের হাতের তরবারির ওজন অনেক বেশি। ওজনের কারণে তরবারি চালানোর ক্ষিপ্রতা তাদের নেই। কম ওজনের তরবারি দেওয়া হয়েছিল। ফলাফল আরও খারাপ। অনভ্যস্ততার কারণে হালকা তলোয়ার এরা চালাতেই পারে না।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হস্তীবাহিনীর ভয়ে তারা ভীত। হিন্দুস্থানের যুদ্ধে হস্তীবাহিনী থাকবেই—এই সত্যটা পারস্যবাহিনীর মাথায় এখনো ঢোকে নি।

হুমায়ূন জানিয়েছেন, পারস্যবাহিনীর এখন আর তাঁর প্রয়োজন নেই। তারা যেন পারস্যে চলে যায়।

পারস্যবাহিনীর প্রধান বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন, তারা পারস্য ফিরে যেতে আগ্রহী না। বাকি জীবন তারা হুমায়ূনের সেবা করবে। তারা ফিরে যেতে চাচ্ছে না কেন তাও পরিষ্কার না।

হুমায়ূনের রাজকীয় কাফেলা এখন আছে 'পাঞ্জশীরে'। জায়গাটা অতীব মনোরম। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা ফলের বাগান। সবুজ মাঠ। ছোট ছোট টিলা। বনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি যে নদী গিয়েছে, তার জল কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। হুমায়ূনকে বেশির ভাগ সময় দেখা যায় নদীর উপরের বড় পাথরের চাঁইয়ে বসে আছেন। হাতে মীর্জা

কামরানের লাইব্রেরির কোনো একটা বই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর বই পড়তেই এখন তিনি আগ্রহী। পারস্যে তিনি মানমন্দির দেখে এসেছেন। রাজ্য ফিরে পেলে পারস্যের মতো একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা তাঁর গোপন বাসনা। আকাশে শুক্র গ্রহ দেখা গেলে ফজরের নামাজের সময় হয়। যখন গ্রহটি আর দেখা যায় না, তখন ফজরের নামাজের সময় শেষ। এই তথ্য তিনি পারস্য মানমন্দির থেকে জেনে এসেছেন। বিষয়টি এখনো পরীক্ষা করা হয় নি।

হুমায়ূন পাঠে মগ্ন। তার দুটি পা পানি স্পর্শ করে আছে। পানি শীতল। মাঝে মাঝেই তাকে পা পানি থেকে তুলতে হচ্ছে। হুমায়ূনের আনন্দময় সময়ে জওহর আবতাবচি দুঃসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো।

মীর্জা কামরান আবার কাবুল দখল করেছেন এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছেন।

হুমায়ূন বই বন্ধ করতে করতে বললেন, আফসোস। বৈরাম খাঁকে ডেকে নিয়ে আসো।

জওহর ছুটে যেতে গিয়ে পাথরে ধাক্কা খেয়ে পানিতে পড়ে গেল। হুমায়ূন তাকে টেনে তুলতে তুলতে বললেন, কোরান শরিফের একটি আয়াতে বলা হয়েছে 'হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।' জওহর-তাড়াহুড়ার কিছু নেই। যা নিয়তিতে নির্ধারিত তা-ই হবে। তাড়াহুড়া করে কিছু হবে না।

পাশাপাশি দু'টা পাথর। একটিতে হুমায়ূন বসেছেন, অন্যটিতে বৈরাম খাঁ। বৈরাম খাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে। এত চিন্তিত তাঁকে সচরাচর দেখা যায় না। চিন্তার প্রধান কারণ হামিদা বানু এবং তাঁর শিশুপুত্র আকবর কামরানের হাতে আটক হয়েছেন। এই খবর হুমায়ূন জানেন না। হামিদা বানু এবং আকবর ছিলেন কান্দাহার দুর্গে। কান্দাহার থেকে তারা কেন কাবুলে গেলেন, কখন গেলেন তা বৈরাম খাঁ জানেন না।

হুমায়ূন বললেন, আপনি এত চিন্তিত হবেন না। আমার ভাই আকবরের কোনো ক্ষতি করবে না। এটা তৈমুর বংশের ধারা।

জাহাঁপনা, বংশের ধারা সবসময় কাজ করে না।

আমার ভাইদের ক্ষেত্রে করবে।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি এই মুহূর্তেই রওনা হব। আপনি এখানেই থাকবেন। জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়েছে। আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশকে রেখে যাচ্ছি। আপনার নিরাপত্তার জন্যে আপনি নিজেই যথেষ্ট। তারপরেও মীর্জা হিন্দাল থাকবেন।

হুমায়ূন বললেন, বৈরাম খাঁ, আমি আপনার সঙ্গে যাব। এখন পর্যন্ত এমন কোনো যুদ্ধ হয় নি যেখানে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করি নি।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনি এখানেই থাকবেন। ভবিষ্যতে অনেক যুদ্ধ হবে। কোনোটাতেই আপনাকে অংশগ্রহণ করতে হবে না। যা করতে আপনার পছন্দ আপনি তা-ই করবেন। বই পড়বেন, ছবি আঁকবেন, গান শুনবেন। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমি যুদ্ধযাত্রা করি?

সম্রাট হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

মীর্জা কামরানের বিশেষ দূত এসেছে ইসলাম শাহ্‌'র কাছে। দূতের কাছে পত্রে কামরান লিখেছেন—

হাস্য পরিহাসে পটু
দিল্লীর সিংহাসনের মালিক
ইসলাম শাহ্‌

জনাব,

আপনার সাহায্য এবং মূল্যবান পরামর্শ ছাড়াই
আমি কাবুল দখল করেছি। আগের ভুল এ দফায়

করি নাই। দুর্গ দুর্ভেদ্য। হুমায়ূনের অপদার্থ পারস্য-সৈনিকরা কিছুই করতে পারবে না।

কাবুল দখল করলে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন বলেছিলেন। এখন সাহায্য করুন।

আপনার জন্যে একটি শের পাঠালাম। কাবুল দুর্গ দখলের পরপর এই শেরটি আপনাতেই আমার মাথায় আসে—

"রাজ্য হলো এমন এক রূপসী তরুণী
যার ঠোঁটে চুমু খেতে হলে
সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রয়োজন হয়।"

হুমায়ূন এখন কোথায় আছেন আমি জানি। আপনার সাহায্য পেলেই তাঁকে শিকল পরিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত করব। আপনি তাঁর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা কিংবা কাব্য আলোচনা করতে পারেন। হুমায়ূন কাব্য আলোচনায় বিশেষ পারদর্শী।

ইতি
মীর্জা কামরান

ইসলাম শাহ্ মীর্জা কামরানের দূতের হাতে পাঁচটি তাম্রমুদ্রা দিয়ে দিলেন।

মীর্জা কামরান দুর্গ রক্ষায় নতুন পরিকল্পনা করেছেন। দুর্গের ভেতর শুধু কামানচিদের রাখা হয়েছে। তারা দুর্গপ্রাচীরের চারদিকেই কামান বসিয়েছে।

কামরানের মূল সৈন্যবাহিনী দুর্গের বাইরে গোপনে অবস্থান করছে। বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং মীর্জা কামরান।

বৈরাম খাঁ ঘোড়সোয়ার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন—এই খবর পাওয়া গেছে। বৈরাম খাঁ দুর্গ আক্রমণের পর কামান দাগা শুরু হবে। দুর্গের ভেতর থেকে গোলাবর্ষণ বন্ধ হওয়ামাত্র মীর্জা কামরান পেছন থেকে আক্রমণ করবেন। তাঁর মূল লক্ষ্য থাকবে হুমায়ূনকে হত্যা করা। গত কয়েকবারের যুদ্ধে দেখা গেছে, বৈরাম খাঁ'র প্রধান চেষ্টা থাকে হুমায়ূনকে মূল যুদ্ধের বাইরে রাখা। এবারও তাই হবে। হুমায়ূন থাকবেন কামানের গোলার সীমানার বাইরে। পেছন থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ হবে।

যুদ্ধ এবং প্রেমে কোনোকিছুই পরিকল্পনামতো হয় না। বৈরাম খাঁ সঙ্গে হুমায়ূনকে আনেন নি। এবং তিনি দুর্গ আক্রমণ করলেন না। কামানের গোলার সীমানার বাইরে অবস্থান নিলেন। নিজের কামানগুলি দুর্গ বরাবর তাক না করে তাঁর সৈন্যদলের পেছনে বসালেন যেন শত্রু পেছন থেকে আসতে না পারে। দুর্গ লক্ষ্য করে কামান দাগাও যাচ্ছে না। শিশু আকবর সেখানে আছে, গোলার আঘাতে তার ক্ষতি হতে পারে।

মীর্জা কামরান দ্রুত নতুন পরিকল্পনা করলেন। তিনি হুমায়ূন যেখানে আছেন সেখানে চলে যাবেন। বৈরাম খাঁ দুর্গ জয়ে ব্যস্ত থাকবে, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন হুমায়ূনের শিবিরে।

বৈরাম খাঁ ফজর ওয়াক্তে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই দুর্গ দখল করলেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। মসজিদে হুমায়ূনের নামে খুৎবা পাঠের শেষে শিশু আকবর এবং হামিদা বানুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

রাতের প্রথম প্রহর। তাঁবুর বাইরে হুমায়ূন গালিচা পেতে বসেছেন। আফিম সেবন করবেন, তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হুমায়ূনের মন খানিকটা বিক্ষিপ্ত। কাবুল জয়ের কোনো খবর এখনো তাঁর কাছে পৌঁছায় নি। এই মুহূর্তে তিনি জোনাকি দেখছেন। এই অঞ্চলের মতো

জোনাকি আর কোথাও তিনি দেখেন নি। শত শত জোনাকি দল বেঁধে ঘুরছে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সবাই একসঙ্গে আলো নিভিয়ে দিচ্ছে। তখন মনে হয় কোনো জোনাকি নেই। আবার তারা আলো জ্বালাচ্ছে।

জোনাকি পোকা অনুসরণ করতে গিয়ে নতুন খাটানো ছোট্ট একটা তাঁবুর দিকে হুমায়ূনের চোখ গেল। বিশেষত্বহীন তাঁবু, কিন্তু ছয়জন সৈনিক তাঁবুটি পাহারা দিচ্ছে। তিনি জওহরকে বললেন, তাঁবুটা কার ?

জওর বলল, বৈরাম খাঁ'র।

তাঁবুর চারদিকে পাহারা কেন ?

জানি না জাহাঁপনা।

অনুসন্ধান করো।

আপনার অনুমতি ছাড়াই আমি অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়েছিলাম। সৈনিকরা আমাকে তাঁবুর কাছে যেতে দেয় নাই।

হুমায়ূন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁবু রহস্য ভেদ করে তিনি আফিম নিয়ে বসবেন। তাঁকে খানিকটা চিন্তিত মনে হলো।

তিনি তাঁবুর কাছে যেতেই সৈনিকরা কুর্নিশ করে সরে দাঁড়াল। হুমায়ূন বললেন, তাঁবুর ভেতর কী ?

সৈনিকরা বলল, তাঁবুর ভেতর একজন কেউ আছে। সে কে আমরা জানি না জাহাঁপনা। বৈরাম খাঁ তাকে তাঁবুতে রেখেছেন। আমাদের ওপর নির্দেশ সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ যেন তাঁবুতে ঢুকতে না পারে।

হুমায়ূন পর্দা সরিয়ে তাঁবুতে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবিকল তাঁর মতো দেখতে এবং তাঁর সাজ পোশাকে একজন কে তাঁবুর ভেতরে চারপাই-এ বসে আছে। সে সম্রাটকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং কুর্নিশ করল। হুমায়ূন বলল, তুমি কে ?

জাহাঁপনা আমি একজন তুর্ক। আমার নাম হামজা।

তুমি দেখতে অবিকল আমার মতো এটা জানো ?

জানি জাহাঁপনা। এই জন্যেই আমাকে আটকে রাখা হয়েছে।

তুমি দেখতে আমার মতো এটা কোনো অপরাধ হতে পারে না। ঘটনা আমাকে খুলে বলো।

জাহাঁপনা, আমি দুসরা হুমায়ূন। যদি কোনো দুর্ঘটনায় আপনার প্রাণহানি হয়, তখন আমাকে দেখিয়ে বলা হবে হুমায়ূন জীবিত। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা।

তোমার পেশা কী ?

জাহাঁপনা, আমি একজন মুচি। পাদুকা সেলাই করি।

হুমায়ূন বললেন, একই চেহারার দুজন মানুষ, একজন সম্রাট আরেকজন পাদুকা সেলাই করে। কী আশ্চর্য! তুমি আজ রাতে আমার সঙ্গে খানা খাবে।

জাহাঁপনা, এই তাঁবুর বাইরে যাওয়ার আমার হুকুম নাই।

তোমার জন্মতারিখ কী ?

আমার মতো মানুষদের জন্মতারিখ কেউ রাখে না জাহাঁপনা।

বিবাহ করেছ ?

জি জাহাঁপনা।

স্ত্রীর নাম কী ?

যদি গোস্তাকি না নেন তাহলেই স্ত্রীর নাম বলতে পারি।

গোস্তাকি নেব না।

আমার স্ত্রীর নাম হামিদা।

হুমায়ূন বিড়বিড় করে যে শের আবৃত্তি করলেন তার অর্থ

> 'বিশ্বের বিপুল রহস্যের আমরা যেটুকু জানি
> তাও রহস্যে ঢাকা॥'

নিজ তাঁবুতে ফিরে তেমন কোনো কারণ ছাড়াই হুমায়ূন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রবল জ্বরে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। বিকারের ঘোরে বারবার ডাকতে লাগলেন, আকিকা বেগম! তুমি কোথায় ? আকিকা!

সবাই যখন হুমায়ূনকে নিয়ে ব্যস্ত ঠিক তখনই মীর্জা কামরান তাঁর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতর্কিত আক্রমণে হুমায়ূনের বাহিনী হকচকিয়ে গেল। মীর্জা কামরান ব্যূহের ভেতর ঢুকে পড়ল। যে-কোনো মুহূর্তে হুমায়ূনের তাঁবু আক্রান্ত হবে এমন অবস্থা।

হুমায়ূনকে রক্ষার জন্যে মীর্জা হিন্দাল এগিয়ে গেলেন। মীর্জা কামরান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন, তবে একা গেলেন না। তাঁর ছোটভাইয়ের 'প্রাণ' সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মীর্জা হিন্দাল যুদ্ধে নিহত হলেন।

বৈরাম খাঁ শিশু আকবর, তার মা হামিদা বানু এবং হুমায়ূন-মাতা মাহিম বেগমকে নিয়ে ফিরলেন পরদিন ভোরে।

বৈরাম খাঁ'র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হুমায়ূন অচেতন, মীর্জা হিন্দাল নিহত। সৈন্যবাহিনী লণ্ডভণ্ড।

দুটি মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়েছে। দিল্লীর সিংহাসনের অধিকর্তা ইসলাম শাহ্‌র মৃত্যু এবং বাবরপুত্র হুমায়ূনের মৃত্যু।

ইসলাম শাহ্‌'র উত্তরাধিকারী তিনজন। তারা সিংহাসনের দখল নেওয়ার চেষ্টায় আছেন। জায়গায় জায়গায় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ছোট রাজ্যের রাজারা কোন পক্ষ নেবেন ঠিক করতে ব্যস্ত।

হুমায়ূনের উত্তরাধিকারী শিশু আকবর। মোগল শিবির শান্ত। আমীরদের মধ্যেই যা কিছু অস্থিরতা। তাঁরা জানতে চান হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ কতটুকু সত্যি!

হুমায়ূন গুরুতর অসুস্থ এটা সত্যি। রাজমহিষীরা সবাই চলে এসেছেন এটাও সত্যি। অসুস্থ হুমায়ূন রাজমহিষীদের তত্ত্বাবধায়নে আছেন। তাঁরা হুমায়ূন সম্পর্কে কোনো তথ্যই জানাচ্ছেন না। সম্রাটের ব্যক্তিগত মৌলানাকে তাঁবুতে ঢুকে চিন্তিত অবস্থায় বের হতে দেখা গেছে। সম্ভবত তিনি শেষযাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে তওবা করিয়েছেন।

আমীররা বৈরাম খাঁ'র সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন। বৈরাম খাঁ'র কাছ থেকে ভেতরের খবর যদি কিছু পাওয়া যায়।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমার ধারণা সম্রাট হুমায়ূন মৃত। রাজমহিষীদের কাছ থেকে ইঙ্গিত সে রকম পাচ্ছি।

আমীরদের একজন (সালার খাঁ) বললেন, এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনারা চিন্তা করে বের করুন কী করবেন। সত্যি সত্যি সম্রাটের মৃত্যু হয়ে থাকলে আমি আছি যুবরাজ আকবরের পেছনে।

আকবর একজন শিশু।

বৈরাম খাঁ বললেন, শিশু বড় হবে। ততদিন আপনারা থাকবেন শিশুর অভিভাবক। আর আপনারা যদি মনে করেন এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় না থেকে মীর্জা কামরানের সঙ্গে যোগ দেবেন সেই পথও খোলা। মীর্জা হিন্দাল নিহত—এই খবর আপনারা জানেন। তিনি বীরের মতো ভাইয়ের জন্যে যুদ্ধ করে মরেছেন। মীর্জা আসকারি আমাদের সঙ্গেই বন্দি অবস্থায় আছেন। মীর্জা কামরান শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর হাত শক্তিশালী করতে চান, করতে পারেন।

আরেক আমীর বললেন, কেউ যদি অন্য শিবিরে যেতে চায় তাকে বাধা দেওয়া হবে না ?

বৈরাম খাঁ বললেন, সম্রাট অসুস্থ। তিনি এই বিষয়ে কোনো ফরমান জারি করতে পারছেন না। আমি শুধু সেনাবাহিনীর প্রধান, আমার পদমর্যাদা আমীরদের নিচে।

বৈঠকের শেষে তিনজন আমীর জানালেন, তাঁরা হুমায়ূনের শিবিরে থাকবেন না, তবে মীর্জা কামরানের দলেও যোগ দেবেন না। তাঁদের রাজনীতির প্রতি বৈরাগ্য চলে এসেছে। তাঁরা মক্কায় হজ করতে যাবেন। সেখান থেকে ফেরার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

বৈরাম খাঁ বললেন, এমন যদি হয়, আমাদের সম্রাট সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন তাহলে কি আপনারা হজে যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করবেন ?

আমীররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। বৈরাম খাঁ ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। যতই দিন যাচ্ছে বৈরাম খাঁ'র আচার-আচরণ ততই রহস্যময় হয়ে উঠছে।

বৈরাম খাঁ বললেন, সম্রাট হুমায়ূন সম্পূর্ণ সুস্থ। স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তিনি চিল্লায় ছিলেন। চিল্লার মেয়াদ আগামীকাল ফজর ওয়াক্তে শেষ হবে। তিনি তখন সবাইকে দর্শন দেবেন।

আমীররা সবাই একসঙ্গে বললেন, মারহাবা।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনাদের মধ্যে যারা মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তারা সম্রাটের দর্শন পাবেন না। তাঁদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে।

প্রধান আমীর ফৈয়জ খাঁ বললেন, এই সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারেন না।

বৈরাম খাঁ বললেন, এই সিদ্ধান্ত আমার না। সম্রাট হুমায়ূনের। তিনি অবিশ্বস্ত আমীরদের আলাদা করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। এই দায়িত্ব আমি ভালোমতো সম্পন্ন করেছি। সম্রাটের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটানো আমার একটি কৌশল মাত্র।

ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে। প্রধান আমীরকে নিয়ে বৈরাম খাঁ নদীর কাছে গেছেন। পাথরের উপর বসে হুমায়ূন বই পড়ছেন। আমীরের কুর্নিশের জবাবে তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

ফৈয়জ খাঁ বললেন, ইনি আমাদের সম্রাট না। আপনি তাকে ঠিকমতো শিখিয়ে দেন নাই কুর্নিশের জবাবে কী করতে হয়।

বৈরাম খাঁ বললেন, এই কাজটা আমি আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। আপনি শেখাবেন।

সম্রাট কি তাহলে ইন্তেকাল করেছেন ?

না। তবে তাঁর অবস্থা সঙ্গিন। যে-কোনো মুহূর্তে আমরা তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাব।

হায় আল্লাহ্। কী দুঃসংবাদ!

বৈরাম খাঁ বললেন, প্রতিটি দুঃসংবাদের সঙ্গে একটি সুসংবাদ থাকে। সুসংবাদ শুনুন। পাঞ্জাবের রাজা সুলতান আদম গক্করের হাতে মীর্জা কামরান বন্দি হয়েছেন। সম্রাট হুমায়ূনের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তিনি বন্দি কামরানকে হস্তান্তর করতে চান।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। এখন আপনার পরিকল্পনা কী ?

বৈরাম খাঁ বললেন, সম্রাট হুমায়ূন জীবিত থাকুন বা মৃত থাকুন আমি দিল্লী দখল করব। এই সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না। সুলতান শাহ্'র তিনপুত্র নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করেছে। এরা কেউ আমার বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

ফৈয়জ খাঁ বললেন, সিকান্দর শাহ্'র কিন্তু বিশাল বাহিনী।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি পাঞ্জাব দিয়ে ঢুকব। সিকান্দর শাহ্'র কল্পনাতেও নাই কেউ পাঞ্জাব দিয়ে ঢুকে তাকে আক্রমণ করতে পারে।

যুদ্ধযাত্রায় নকল হুমায়ূন থাকবেন ?

অবশ্যই। সে থাকবে হাতির পিঠে। আপনি অন্য আমীরদের নিয়ে তাকে ঘিরে থাকবেন। যাতে নকল হুমায়ূনকে স্পষ্ট দেখা না যায়।

আপনার সাহসের তারিফ করছি।

বৈরাম খাঁ বললেন, বুদ্ধির তারিফ করছেন না ?

অবশ্যই।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমার প্রিয় সম্রাট পবিত্র কোরানের একটি আয়াত প্রায়ই পাঠ করতেন। সেই আয়াতে আল্লাহ্পাক বলছেন, "আমি

তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।" দেখা যাক সম্রাট হুমায়ূনের ভাগ্যে কী লেখা।

বৈরাম খাঁ শেষ মুহূর্তে হাতির পিঠে করে নকল হুমায়ূনের যাত্রা বাতিল করলেন। তিনি ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে অতি দ্রুত অগ্রসর হবেন। হাতি যথেষ্ট দ্রুতগামী হলেও ঘোড়ার অনেক পিছনে পড়ে থাকবে।

হুমায়ূনের জীবনের আশা সবাই ত্যাগ করেছেন। আগে বেদানার রস খানিকটা মুখে নিতেন, পুরো এক দিন এক রাত্রি পার হয়েছে বেদানার রসও মুখে নিতে পারছেন না। তাঁর চোখ বন্ধ। আগে ডাকলে অস্ফুট শব্দ করে সাড়া দিতেন। এখন সাড়াও দিচ্ছেন না। হুমায়ূন-মাতা মাহিম বেগমকে চিকিৎসক পুত্রের আরোগ্য লাভের আশা ছেড়ে মন শক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। মাহিম বেগম অর্ধমৃত অবস্থায় আছেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখন মধ্যরাত্রি। বহু বছর আগের একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। হুমায়ূনের বিছানার চারপাশ দিয়ে হামিদা বানু হাঁটতে হাঁটতে বলছেন, আমার প্রাণের বিনিময়ে হে আল্লাহ্‌পাক তুমি সম্রাটের জীবন ভিক্ষা দাও।

চতুর্থবার ঘূর্ণন শেষ করে হামিদা বানু চমকে তাকালেন, হুমায়ূন চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। মায়াময় হাসি হাসি চোখ। হুমায়ূন বললেন, হামিদা! বিড়বিড় করে কী বলছ? হামিদা বানু ছুটে এসে সম্রাটকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কিছুক্ষণ আগে খবর এসেছে বৈরাম খাঁ সিকান্দর শাহ্‌কে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেছেন। আপনি এখন হিন্দুস্থানের সম্রাট।

হুমায়ূন ক্ষীণ গলায় বললেন, এই সংবাদ আমি পেয়েছি।

কীভাবে পেয়েছেন ?

আমার কন্যা আকিকা বেগম স্বপ্নে এসে আমাকে বলেছে। গরম পানির ব্যবস্থা করতে বলো। আমি স্নান করে শোকরানা নামাজ পড়ব।

উঠে বসার সামর্থ্য কি আপনার আছে ?

হ্যাঁ আছে। ইনশাল্লাহ। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

আচার্য হরিশংকর তার ঘরে। বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর হাতের কাছে মালশায় আগুন জ্বলছে। তিনি মালশার আগুনে মাঝে মাঝে হাত সেঁকছেন। আগুনের উত্তাপে তাঁর খানিকটা আরাম বোধ হয়। ঘরে পচা মাংসের বিকট দুর্গন্ধ। হরিশংকর ফুট-ফরমাস খাটার জন্যে যে ছেলেটিকে রেখেছিলেন, সে পালিয়েছে। মালশায় আগুন অনেক কষ্টে হরিশংকর নিজেই জ্বালিয়েছেন। হরিশংকরের প্রচণ্ড পানির পিপাসা পেয়েছে। পানি দেওয়ার কেউ নেই। খাট থেকে নেমে পানির সন্ধান করবেন সেই শক্তি পাচ্ছেন না।

ব্যাধি সারা শরীরে ছড়িয়েছে। এতদিন যন্ত্রণাবোধ ছিল না। এখন হঠাৎ হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। এই যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। মৃত্যু আসছে না।

আমার বাবা কোথায় জানেন ?

হরিশংকর তাকালেন, আকিকা বেগম নামের প্রেতটা আবার এসেছে। রোগ থেকে তাঁর যেমন মুক্তি নেই, প্রেতের হাত থেকেও মুক্তি নেই।

আকিকা বেগম বলল, আমার বাবা এখন হিন্দুস্থানের সম্রাট।

হরিশংকর বললেন, এই যা যা। না গেলে তোর গায়ে আগুন ছুঁড়ে মারব।

আকিকা বেগম খিলখিল করে হাসছে। হরিশংকর আগুনের মালশা ছুঁড়ে মারলেন। জ্বলন্ত কয়লা ঘরময় ছড়াল। কাপড়ে লাগল। দেখতে দেখতে ঘরে আগুন ধরে গেল। আগুন এগিয়ে আসছে হরিশংকরের দিকে। হরিশংকর নড়লেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন, তারিখ ২৩ জুলাই ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর ডানপাশে শিশুপুত্র আকবর। আকবরের মাথায় পাগড়ি পরানো ছিল। সে পাগড়ি খুলে ফেলেছে। পাগড়ি নিয়ে খেলছে।

নকিব ঘোষণা দিল—

> আল সুলতান আল আজম ওয়াল খাকাল আল মোকাররম, জামিই সুলতানাত-ই-হাকিকি ওয়া মাজাজি, সৈয়দ আলসালাতিন, আবুল মোজাফফর নাসিরুদ্দিন মোহম্মদ হুমায়ূন পাদশাহ গাজি জিল্লুললাহ।

আমীররা একে একে এসে সম্রাট হুমায়ূনের হাত চুম্বন করলেন। সম্রাট সবার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আমীরদের পর এলেন বৈরাম খাঁ। হুমায়ূন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বৈরাম খাঁকে চমকে দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, বৈরাম খাঁকে আমি 'খান খানান' (রাজাদের রাজা) সম্মানে সম্মানিত করছি। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। হঠাৎ মারা যেতে পারি। এমন কিছু ঘটলে নকল হুমায়ূন দিয়ে সিংহাসন রক্ষা করতে হবে না। আমার অবর্তমানে উনি হবেন আকবরের অভিভাবক। আকবর বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈরাম খাঁ'র নির্দেশে হিন্দুস্থান চলবে।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় সম্রাট অনেক কষ্ট

করেছেন। তাঁকে আমি আর কোনো কষ্ট করতে দেব না। বাকি জীবন অবশ্যই তিনি কাটাবেন মনের আনন্দে। আমাদের চারপাশে অনেক বিদ্রোহী আফগান দল আছে। তারা বিশৃঙ্খলার চেষ্টা চালাবে। সম্রাটকে এইসব কিছুই দেখতে হবে না। আমি দেখব।

আমীররা বললেন, মার্‌হাবা।

চিকের আড়াল থেকে মহিলাদের চাপা হাসি শোনা যাচ্ছে। অন্তঃপুরের সবাই দীর্ঘদিন পর দরবার শুরুর দৃশ্য দেখতে এসেছেন। মেয়েদের কণ্ঠস্বর এত উঁচু হওয়া উচিত না যে অন্য পুরুষরা তা শুনতে পান।

সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করে উঁচু গলায় গুলবদন বললেন, আমার ভাই হিন্দুস্থানের সম্রাট পাদশাহ্ হুমায়ূনকে মোবারকবাদ।

হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় মীর্জা কামরানকে প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে। প্রকোষ্ঠের বাইরে অস্ত্রধারী সৈনিকরা পাহারায় আছে। সম্রাটের নির্দেশে জওহর মীর্জা কামরানের কাছে এসেছে। জওহরকে বলা হয়েছে সে যেন কামরানকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে।

কামরান বললেন, তুমি কি আগে কখনো আমার নফর ছিলে ?

জওহর বলল, না জনাব। আমি সবসময়ই সম্রাটের আবতাবচি ছিলাম। এখনো আছি।

কামরান বললেন, আমার কয়েকদিনের রোজা রাখা হয় নি। তুমি কি আমার হয়ে কাজা রোজা রাখতে পারবে ?

জওহর বলল, অবশ্যই পারব। তবে আপনার রোজা আপনারই রাখা উচিত।

শিকলের কারণে আমি নামাজ পড়তে পারছি না। তুমি সম্রাটকে বলে আমার নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দাও।

জওহর বললেন, ইশারায় নামাজ পড়ার বিধান আছে। আপনি ইশারায় নামাজ পড়ুন।

আরে বুরবাক, ইশারায় নামাজ না হয় পড়লাম, ইশারায় অজু করব কীভাবে ?

কঠিন দুঃসময়ের নামাজে অজু লাগে না।

কামরান বললেন, তাও ঠিক। তুমি আমার বিষয়ে কী শুনেছ ? আমার কি মৃত্যুদণ্ড হবে ?

আমি অতি তুচ্ছ একজন পানিবাহক। আমার সঙ্গে এই বিষয়ে কারোর কথা কেন হবে ?

তাও ঠিক। আচ্ছা শোনো, মীর্জা আসকারিকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

আপনি তো জানেন তাকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

আমি কিছুই জানি না। আমাকে কিছু জানানো হয় না।

জওহর বলল, সম্রাট তাকে ক্ষমা করেছেন। নিজ খরচায় তাঁকে মক্কা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

মীর্জা কামরান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আবারও তোমার সম্রাট ভুল করলেন। সে যে মক্কা থেকে ফিরে আসবে না এবং সৈন্য সংগ্রহ করবে না এই নিশ্চয়তা কি ? আমি সম্রাট হলে তাকে মক্কা পাঠাতাম, তবে আগে চোখ তুলে নিতাম।

জওহর বলল, কেউ কারও মতো না।

তা ঠিক। আমাকে কবে সম্রাটের কাছে নেওয়া হবে তা কি জানো ?

জনাব, আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমি একজন তুচ্ছ আবতাবচি।

মীর্জা কামরান বললেন, তুচ্ছও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়। এই বিষয়ে একটা শের শুনতে চাও ?

আপনি শোনাতে চাইলে আগ্রহ নিয়ে শুনব।

মীর্জা কামরান বললেন,

ধুলার একটি তুচ্ছ কণা
চোখকে অচল করে দিতে সক্ষম।

জওহর বলল, অতি উত্তম শের। মার্‌হাবা।

তোমার সম্রাট হুমায়ূনের শের কি আমার চেয়ে উত্তম ?

দুজনের শের বিবেচনার যোগ্যতা আমার নেই জনাব।

কামরান বললেন, তোমার যোগ্যতা পানির মশক বগলে নিয়ে ঘোরাঘুরিতে সীমাবদ্ধ।

জওহর বলল, একেক জনের কাজ একেক রকম।

মীর্জা কামরান বললেন, অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে বকবক করেছি। আমার মাথা ধরে গেছে, তুমি বিদায় হও।

জওহর ঘর থেকে বের হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান কারারক্ষী মীর্জা কামরানের ঘরে ঢুকল। কামরান বললেন, আমাকে কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে ?

প্রধান কারারক্ষী বলল, না। সম্রাট আপনাকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

তবে আপনার চোখ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আপনাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে মক্কায়।

হতভম্ব কামরান বললেন, চোখ কখন তোলা হবে ?

এখনই।

আমি কি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারব না ?

না। আপনাকে দেখলে আপনার ভাই দুর্বল হয়ে যাবেন। আপনার শাস্তি মওকুফ হয়ে যেতে পারে। কেউ তা চাচ্ছে না।

মীর্জা বললেন, কেউটা কে ?

প্রধান কারারক্ষী বললেন, কেউ-এর মধ্যে সবাই আছেন। আপনার নিজের মা মহামান্য গুলরুখ বেগমও আছেন।

মীর্জা কামরান বললেন, আমাকে নিয়ে চলো। চোখ তোলো।

মীর্জা কামরানের চোখ উৎপাটনের একটি প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ জওহরের বইয়ে আছে। এই রোমহর্ষক বীভৎস বর্ণনা বাদ থাকুক। ছোট্ট একটা অংশ বলা যেতে পারে।

চোখ তোলার জন্যে একজনকে চাকু হাতে মীর্জা কামরানের হাঁটুর উপর বসতে হলো। কামরান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চোখ তুলতে এসেছ চোখ তোলো। হাঁটুতে ব্যথা দিচ্ছ কেন বুরবাক!

মক্কা যাওয়ার দিন কামরানের সঙ্গে হুমায়ূনের দেখা হলো। কামরান তাঁর কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

সম্রাট বললেন, ভাই, তুমি কবিতা পড়ো।

মীর্জা কামরান দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করলেন।

কবিতাটির শুরু এরকম—

> মাটির ভাণ্ডে অমৃত ধারণ করা যায় না।
> আমি মীর্জা কামরান মাটির ভাণ্ড ছাড়া কিছু না।
> আমি গরল ধারণ করতে পারি
> অমৃত কখনো না।
> হুমায়ূন স্বর্ণভাণ্ড
> তিনি একারণেই হৃদয়ে অমৃত
> ধারণ করতে পেরেছেন।...

সম্রাট হুমায়ূন কবিতা শুনে শিশুদের মতো হাউমাউ করে কাঁদলেন।

বীরভূমের নোকরা গ্রামে হুমায়ূন তার এক আমীর তখতি খাঁকে পাঠিয়েছেন। হিন্দুস্থান-সম্রাট এই অঞ্চলের লছমি বাই নামের একজনকে তাঁর সঙ্গে আহার করার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। লছমি বাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ষোল বেহারার রাজকীয় পাল্কি এসেছে। তখতি খাঁ সম্রাটের একটি হুকুমনামা সঙ্গে এনেছেন। হুকুমনামায় লছমি বাইকে পাঁচ শ' বিঘা লাখেরাজ জমি দান করা হয়েছে।

তখতি খাঁ অনেক অনুসন্ধান করেও লছমি বাইকে খুঁজে পেলেন না। যেটুকু জানা গেল, লছমি বাই-এর স্বামী এবং পুত্র ডাকাতের হাতে নিহত হয়। লছমি বাই চরম অভাবে পর্যুদস্ত হয়ে ভিক্ষুক দলভুক্ত হয়। অনেক দিন সে নোকরা গ্রামেই ভিক্ষা করত। দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে নেই।

সৌভাগ্য লছমি বাই-এর পাশ দিয়ে গেল। বেচারি তা স্পর্শ করতে পারল না।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্রাট হুমায়ূন লাইব্রেরিতে। ছবির রঙ-বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে এসেছে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রঙ তৈরির কলাকৌশল শিখছেন। পানিতে অদ্রবণীয় রঙ কী করে দ্রবণীয় করা যায় সেই কৌশল পড়ে তিনি মুগ্ধ। তাঁর ইচ্ছা করছে এখনই পরীক্ষা করে দেখতে।

কে যেন সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল। লাইব্রেরির চারদিকে বৈরাম খাঁ'র বিশেষ বাহিনী পাহারা দিচ্ছে। তাদের এড়িয়ে একটি মাছিরও হুমায়ূনের কাছে আসা সম্ভব না। হুমায়ূন চমকে তাকালেন। হামিদা বানু কুর্নিশ করছেন।

হুমায়ূন বললেন, এই মুহূর্তে আমি একটি রাজকীয় ফরমান জারি করছি—সম্রাটকে তার স্ত্রী হামিদা বানুর কুর্নিশ করার প্রয়োজন নেই।

হামিদা বানু হাসলেন। সম্রাট বললেন, এত রাতে এখানে কেন?

হামিদা বানু বললেন, সম্রাট গভীর মন দিয়ে বই পড়ছেন। এই দৃশ্য দেখতে আমার ভালো লাগে। আপনি জানেন না প্রায়ই আমি আড়াল থেকে পাঠরত অবস্থায় আপনাকে দেখি। আজ সামনে এসেছি।

আজ সামনে আসার পেছনে কি কোনো কারণ আছে?

একটা আর্জি নিয়ে এসেছি।

আর্জি মঞ্জুর।

না শুনেই আর্জি মঞ্জুর?

সম্রাট হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললেন, এখন তোমার আর্জি বলো।

হামিদা বানু বললেন, আমরা যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম তখন এক রাতে আমরা খোলা প্রান্তরে ছিলাম। অচেনা এক গাছের নিচে বসেছিলাম। আপনার কি মনে আছে?

আমার মনে আছে।

হামিদা বানু বললেন, আমার খুব শখ আপনাকে নিয়ে ওই জায়গায় আবার যাই।

সম্রাট বললেন, তোমাকে আগেই বলেছি আর্জি মঞ্জুর।

ফিনিক ফোটা জোছনাস্নাত রজনী। হুমায়ূন-পত্নী হামিদা বানু অচেনা এক বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে আছেন। হুমায়ূন কোনো কারণ ছাড়াই বৃক্ষের চারপাশে ঘুরছেন।

সম্রাট একা আসেন নি। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে বৈরাম খাঁ এসেছেন। সেনাবাহিনী দৃষ্টির আড়ালে আছে।

হুমায়ূন বললেন, হামিদা আনন্দ পাচ্ছ?

হামিদা জবাব দিলেন না। ওই রাতে তিনি খিলখিল করে হাসছিলেন। আজ তাঁর চোখভর্তি অশ্রু।

হুমায়ূন হঠাৎ লক্ষ করলেন, হামিদা বানু যেখানে বসে আছেন তার উল্টাদিকে দুটি কিশোরী মেয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের তিনি চেনেন। একজন তাঁর কন্যা আকিকা বেগম। অন্যজন তার বান্ধবী। যার নাম মনে পড়ছে না। সম্রাট নিশ্চিত আফিমের নেশার কারণে হয়তো এ ধরনের বিভ্রম তাঁর মধ্যে তৈরি হচ্ছে। এই মেয়ে এবং তার বান্ধবীকে তিনি রাজপ্রাসাদেও কয়েকবার দেখেছেন।

হুমায়ূন তাদের দিকে কয়েক পা এগুতেই মেয়ে দুটি খিলখিল করে হেসে দৌড়ে পালাল।

হামিদা বানু চমকে উঠে বললেন, কে হাসে ? কে হাসে ?

হুমায়ূন বললেন, কেউ হাসে না হামিদা। হিন্দুস্থানে এক বিচিত্র পাখি আছে, যখন সেই পাখি ডাকে মনে হয় কিশোরী মেয়ে হাসছে। হিন্দুস্থান অতি অদ্ভুত দেশ।

হামিদা বানু বললেন, আপনি কি আমার হাত ধরে একটু বসবেন ? হঠাৎ পাখির ডাক শুনে ভয় পেয়েছি।

হুমায়ূন স্ত্রীর পাশে এসে বসেছেন। তাঁদের গায়ে অবাক জোছনা গলে গলে পড়ছে। দুজনই অপেক্ষা করছেন হিন্দুস্থানের অদ্ভুত পাখির ডাক আরেকবার শোনার জন্যে।

রাজা যায় রাজা আসে। প্রজাও যায়, নতুন প্রজা আসে। কিছুই টিকে থাকে না। ক্ষুধার্ত সময় সবকিছু গিলে ফেলে, তবে 'গল্প' গিলতে পারে না। গল্প থেকে যায়।

বাদশা নামদারের কিছু গল্প শোনানো শেষ হলো।

পরিশিষ্ট

বৈরাম খাঁ কিন্তু খাঁ ছিলেন না। তিনি 'বেগ'। জওহর আবতাবচি তাঁর গ্রন্থে *বৈরাম বেগ* বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁকে খাঁ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন ইরানের শাহ্ তামাস্প।

আমার ধারণা, সম্রাট হুমায়ূন বৈরাম খাঁ'র প্রতিভা ধরতে পারেন নি। তিনি বৈরাম খাঁকে তাঁর অতি অনুগত একজন হিসেবেই জেনেছেন। পারস্য থেকে ফেরার পর সম্রাট হুমায়ূনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। বৈরাম খাঁকে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান *খান-খানান* উপাধি দেন। একই সঙ্গে তাঁর জন্যে পানি সরবরাহের কাজে নিযুক্ত জওহর আবতাবচিকে পাঞ্জাবের রাজকোষের কোষাধ্যক্ষ করে দেন। জওহরের এই নিয়োগ হুমায়ূনের আবেগের কারণে হয়েছে। জওহরের রাজকোষ চালানোর যোগ্যতা ছিল না। সম্রাটের ইচ্ছা বলে কথা।

বৈরাম খাঁ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সম্রাট হুমায়ূনকে সব ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখেন।

সম্রাটের মৃত্যুর পর বালক আকবরের অভিভাবক হিসেবে হিন্দুস্থানের শাসনভার তাঁর হাতে চলে আসে। আমীরদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে।

আকবর মাতা হামিদা বানু নিজেও শংকিত হন। তিনি মনে করেন, বৈরাম খাঁ কখনোই আকবরের হাতে ক্ষমতা দেবেন না। আকবরকে থাকতে হবে বৈরাম খাঁ'র পুতুল হয়ে।

আকবর সিংহাসনে বসেই বৈরাম খাঁকে বললেন, আপনি মোঘল রাজবংশের জন্যে অনেক পরিশ্রম করেছেন। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

বৈরাম খাঁ বললেন, আপনি কি মনে করছেন এখন আমাকে আপনার প্রয়োজন নেই ?

আকবর বললেন, আমার প্রয়োজনের চেয়ে আপনার বিশ্রাম জরুরি।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি বিশ্রামে যাচ্ছি। আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আকবর বললেন, আপনি হিন্দুস্থানে বিশ্রাম করবেন না। বিশ্রাম করবেন মক্কায়।

বৈরাম খাঁ বললেন, আমি স্বেচ্ছায় মক্কায় যেতে না চাইলে আপনার সাধ্যও নেই আমাকে মক্কায় পাঠানো। বিশাল মোঘল সেনাবাহিনীর আমি প্রধান। সৈনিকরা আমার অনুগত। তারপরেও যেহেতু আপনি চাচ্ছেন আমি মক্কায় চলে যাব।

বৈরাম খাঁ আহত এবং বিষণ্ন হৃদয়ে মক্কায় রওনা হলেন। সম্রাট আকবরের পাঠানো গুপ্তঘাতকরা বৈরাম খাঁকে পথেই হত্যা করল।

পৃথিবীর ইতিহাসে আকবরের পরিচয় *আকবর দ্যা গ্রেট*। বৈরাম খাঁ'র করুণ পরিণতি গ্রেট আকবরের কাছ থেকে আশা করা যায় না, তবে প্রদীপের নিচেই থাকে অন্ধকার।